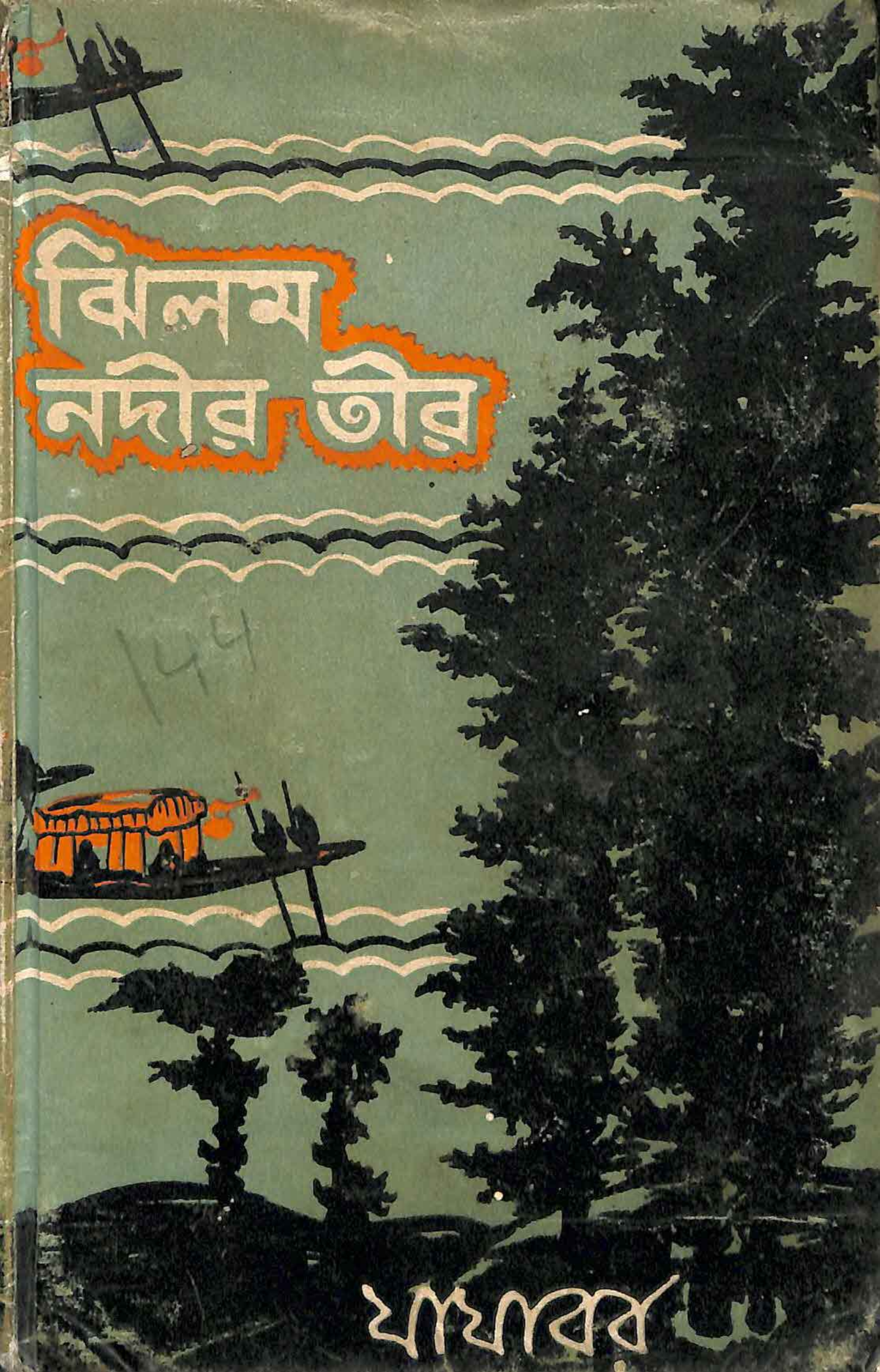

ঝিলম
নদীর তীর
যাযাবর

ঝিলম নদীর তীর

যাযাবর

নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড

প্রথম প্রকাশ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬১
দ্বিতীয় সংস্করণ—আষাঢ়, ১৩৬১
তৃতীয় মুদ্রণ—শ্রাবণ, ১৩৬১
চতুর্থ মুদ্রণ—ভাদ্র, ১৩৬১
পঞ্চম মুদ্রণ—অগ্রহায়ণ, ১৩৬১
ষষ্ঠ মুদ্রণ—মাঘ, ১৩৬১
সপ্তম মুদ্রণ—ফাল্গুন ১৩৬১

প্রকাশক
জে. এন. সিংহ রায়
নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড
২২, ক্যানিং স্ট্রীট
কলিকাতা-১

প্রচ্ছদপট
অজিত গুপ্ত

মুদ্রক
রণজিৎ কুমার দত্ত
নবশক্তি প্রেস
১২৩, লোয়ার সারকুলার রোড
কলিকাতা-১৪

দু' টাকা

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়
শ্রীযুক্তা মনোরমা দেবী
শ্রীচরণকমলেষু।

গ্রন্থকারের অন্যান্য রচনা

দৃষ্টিপাত

জনান্তিক

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

"ঝিলম নদীর তীর" সাময়িক পত্রে খণ্ডিতাকারে প্রকাশিত রচনার পরিবর্ধিত ও পূর্ণতররূপ। সাহিত্যিক শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার ও শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে এর সূচনা। তাঁরা লেখকের অশেষ ধন্যবাদভাজন।

তথ্যসংগ্রহকার্যে যে সকল পুস্তক, পুরাতন দলিল ও সরকারী মুদ্রিত বিবরণীর সাহায্য নেওয়া হয়েছে এবং যাঁরা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও স্মৃতি থেকে সমসাময়িক ইতিহাসের অলিখিত অধ্যায় ও নেপথ্য বৃত্তান্ত গ্রন্থকারের গোচরীভূত করেছেন তাঁদের ঋণও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণীয়। তাঁদের নামের তালিকায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ;—

হোয়ার থ্রি এম্পায়ার্স মিট (ই. এফ. নাইট) ; জম্মু অ্যাণ্ড কাশ্মীর টেরীটরীস (ফ্রেডরিক ড্রু) ; গোলাব সিং (কে. এম. পান্নিকর) ; রেমনিসেন্স অব এ বেঙ্গল সিভিলিয়ান (উইলিয়ম এডোয়ার্ডস) ; ডিফেণ্ডিং কাশ্মীর (পাবলিকেশন ডিভিশন) ; কনডেম্‌ড আনহার্ড (অজ্ঞাত) ; ডেসপাচেস টু দি সেক্রেটারী অব স্টেটস (এইচ. এম. ডুরাণ্ড) ; হিস্টরী অব দি শিখস (কানিংহাম) ; ইউ. এন. কমিশনস রিপোর্ট ; মিশন উইথ মাউণ্টব্যাটেন (এ. ক্যাম্পবেল জনসন) ; হোয়াইট পেপার অন কাশ্মীর (গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া) ; শেখ মহম্মদ আব্দুল্লা ; মাননীয় জি. এম. সাদেক ও মিসেস রাজেন্দ্র সিং।

গ্রন্থকার।

Mountbatten says,
as a military operation, the speed
of the fly-in on the 27th October
left our SEAC efforts standing.

—*Allan Campbell Johnson.*



ঝিলম নদীর তীর

ঝিলম নদীর তীর

হিমালয়ের বরফ গলে গলে হয়েছে নদী। পাহাড়ের গা বেয়ে, পাইনের বন পেরিয়ে, আঁকাবাঁকা পথে সে নদী নেমে এসেছে নীচু মাটিতে। মৌরী ক্ষেতের ধার দিয়ে, উইলো ঝাড়ের কাছ দিয়ে চলে গিয়েছে শহরের বুক চিরে। কাঠের ঘর-বাড়িতে ঢাকা দু'পাশের তীর; মধ্যিখানে ধীরে বয়ে যাচ্ছে জলধারা। অন্ধকারে দূর থেকে দেখায় যেন কনে বউ-এর মাথায় দু'পাশের কালো চুলের মাঝখানে একটানা সরু সিঁথিটি।

ছোট্ট নামটি তার; সহজ ও মিষ্টি। ঝিলম। সকাল বেলা সোনালী রোদের আভা ঠিকরে পরে তার বুকে। সন্ধ্যাবেলা দোলে তারা-ভরা আকাশের ছায়া। ঝিলম ঝিলমিল করে দিন-রাত।

ঝিলম নদীর তীর

নদীর কোল ঘেঁষেই উঠেছে দুধের মতো ধবধবে শ্বেত পাথরে গড়া মস্ত রাজপুরী। দুয়ারে তার সেপাই। সিঁড়িতে তার সান্ত্রী। দেউড়িতে সঙ্গীন উঁচিয়ে কুচকাওয়াজ করে উর্দিপরা পাহারাওয়ালার দল।

পুরানো আমলে এটাই ছিল রাজাদের খাশমহল। বুড়ো মহারাজা জীবন কাটিয়ে গিয়েছেন এখানেই। নতুন রাজার চাল-চলন আলাদা। স্ত্রী পুত্র দাস দাসী নিয়ে তিনি উঠে গিয়েছেন দূরে পাহাড়ের গায়ে বিলাতী ধরনে তৈরী নতুন বাড়িতে। সেখানে সেজের বদলে জ্বলে বিজলী বাতি, হাতীশালের বদলে আছে মোটর গ্যারেজ।

সেকেলে রাজবাড়ি একালে হয়েছে সরকারী আপিস। তকমা-আঁটা কর্মচারীরা সেখানে বসে মহারাজার নামে প্রজা শাসন অর্থাৎ প্রজা শোষণ করে। শুধু বছরে দু'দিন রাজ-দরবার বসে মাঝের গোল হল্ ঘরটিতে। তখন চতুর্দোলায় চেপে রাজা আসেন। পুরানো রাজমহলের সাবেকি জাঁকজমক আবার জেগে ওঠে। আগে সাজে লোক, পিছে সাজে লস্কর। ডাইনে বাজে বাঁশী, বাঁয়ে বাজে মৃদঙ্গ।

দশহরার দরবার দেশের সবচেয়ে বড় পার্বণ, বছরের সব চেয়ে সেরা সমারোহ।

মুক্তার ঝালর আঁটা জড়োয়া চাঁদোয়ার নীচে কিংখাবে মোড়া গজদন্তের সিংহাসন। তাতে বসেছেন রাজা। মহারাজা শ্রীহরি সিং। কাশ্মীরের প্রজাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। সামনে পায়ের কাছে খোলা তলোয়ার হাতে

প্রতিহারী। পিছনে মাথার কাছে ছাতাহাতে ছত্রধর। দু'পাশে চামর দুলিয়ে হাঁওয়া দিচ্ছে আটজন কিঙ্কর কিঙ্করী। রুপোর পিলসুজের মাথায় জ্বলছে সোনার প্রদীপ ; জয়পুরী পাথরের ধূপদানীতে পুড়ছে কস্তুরী ধূপ। জমকালো পোষাকে পাত্র, মিত্র ও অমাত্যরা বসেছেন প্রথম সারিতে। তার পিছনে গণ্যমান্য লোকেদের আসন পড়েছে যার যার মর্যাদা বুঝে। ফুলের শোভায়, জরির সাজে, নানা রঙের আলোর মেলায় ঝলমল করছে সভা-ঘর।

কিন্তু এত ধূমধামের মধ্যেও মহারাজাকে কেমন মনমরা দেখাচ্ছে যেন। তাঁর মুখে কেন নেই হাসি? চোখে কেন নেই খুশি-খুশি ভাব?

সত্যি, মহারাজা হরি সিং-এর মনে একটুও সুখ নেই।

মাস দুই হলো এদেশ থেকে ইংরেজ সরকার চলে গিয়েছে। যাবার বেলায় দেশকে দু'ভাগ করে এক ভাগ দিয়ে গিয়েছে একদল মুসলমানের হাতে। হিন্দুদের সঙ্গে তাদের মহা আড়ি। এক সঙ্গে এক রাজত্বে বাস করতেও তারা রাজী নয়। ভারতবর্ষ থেকে কেটে নেওয়া এই মুসলমানী দেশের নাম হয়েছে, পাকিস্তান।

ইংরেজ আমলের আরও যে-সব দেশীয় রাজা ছিলেন, ইংরেজ যেতে না যেতেই তাঁরা প্রায় সবাই নিজ নিজ রাজ্যের সীমানার মিল দেখে ভাগ হওয়া দেশের এ-দিকে কিম্বা ও-দিকে যোগ দিয়েছে। জয়পুর, গোয়ালিয়র,

কুচবিহার ইত্যাদি মিশেছে ভারতবর্ষে। ভাওয়ালপুর ও কালাত মিশেছে পাকিস্তানে। কাশ্মীর এখনও আছে দোটানায়।

কাশ্মীরের সীমানার যোগ রয়েছে দু' দেশেরই সঙ্গে। পশ্চিমে প্রায় পঁচিশ মাইল ধরে আছে পাকিস্তান। আবার পুব-দক্ষিণে তার সীমানা মিলেছে ভারতবর্ষে। কাশ্মীর কোন্ দেশে যোগ দেবে? মহারাজা মন ঠিক করতে পারেন না। অনেক ভেবে শেষটায় তিনি বললেন, "এখন কোনো দেশেই যোগ দিচ্ছি না। যেমন আছি তেমনি থাকি। পরের ভাবনা পরে হবে।"

মহারাজা যাই ভাবুন, দেখা গেল, পরের আশায় বসে থাকতে অপরেরা রাজী নয়। ভারতবর্ষের নেতারা কিছু বললেন না বটে। ও-দিকে পাকিস্তানের কর্তাদের তো সবুর সয় না। তাঁরা চান কাশ্মীর তক্ষুণি তাঁদের দখলে আসুক। কাশ্মীরের মহারাজা হিন্দু। ডোগরা রাজপুত। রাজ্যের প্রজারা বেশীর ভাগ মুসলমান। পাকিস্তানের বড় নেতারা মাথা নেড়ে বললেন, "এ অসহ্য।" বাবু যত কন, পারিষদগণ কহে তার শত গুণ। ক্ষুদে নেতারা ঘুষি বাগিয়ে হুঙ্কার দিলেন, "লড়কে লেঙ্গে—।"

যেই কথা সেই কাজ। প্রথমে শুরু হলো অভাব অনটনের চাপ দেওয়া। হাতে না মেরে ভাতে মারার ফন্দি।

কাশ্মীর পাহাড়ী রাজ্য। চাষবাসের দেশ। ক্ষেতে

ধান আর বাগানে ফল,—এই হলো সেখানকার মোটামুটি ফসল। অন্য সব জিনিষ তাকে আনতে হয় বাইরে থেকে। লাহোর বা রাওলপিণ্ডির পথে চালান আসতো এতকাল। পাকিস্তান বন্ধ করে দিলো তা'। তখন পেট্রোলের অভাবে কাশ্মীরের পথে মোটর বাস অচল হলো, কাগজের অভাবে স্কুল কলেজে লেখাপড়া বন্ধ, চিনির অভাবে ময়রার দোকানে সন্দেশের থালা পড়ে রইল খালি। রাজ্যে রোগী পায় না ওষুধ, শিশু পায় না পথ্য। নেহাত গরীব যে দিনমজুর, একটু নুন না মেলাতে তারও মুখে ভাত রোচে না।

এ তো শুধু আরম্ভ। যেমন ফাঁসির আগে হাজত, মারের আগে ধমকানি। সেপ্টেম্বর মাসের গোড়া থেকে শুরু হলো জবরদস্তি হামলা। রোজই সীমানার ও-পার থেকে পাকিস্তানীরা দল বেঁধে কাশ্মীরের গ্রামে ঢুকে লুঠতরাজ করতে লাগল।

গত চার দিনে অবস্থা আরও সঙ্গীন হয়েছে। খবর এসেছে, যুদ্ধের সৈন্যদের মতো হাজার হাজার হানাদার কাশ্মীর রাজ্য আক্রমণ করেছে। ভিন্ন ভিন্ন দলে শত্রু রাজ্যের নানা জায়গায় সীমানা পার হয়ে গ্রামের পর গ্রাম দখল করেছে। সব চেয়ে বড় দলটা এগিয়ে আসছে মোটর লরী চেপে ডোমেলের পথে রাজধানী শ্রীনগরের দিকে। সে-দলে আছে হাজারখানেক উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের উপজাতি, কয়েক শ' পাঠান আফ্রিদি, আর

ঝিলম নদীর তীর

অগুণতি মুসলীম লীগের ভলান্টিয়ার,—নিজেদের তারা বলে, "মুসলীম ন্যাশন্যাল গার্ড।"

দেশীয় রাজ্যগুলি এতকাল আপদে বিপদে নির্ভর করেছে ব্রিটিশ সরকারের উপর। তাদের নিজেদের সৈন্য যা' ছিল, সে শুধু নামকাওয়াস্তে। কাশ্মীরের সৈন্য-সংখ্যা সামান্য। তারও আবার অর্ধেক ছিল মুসলমান। শক্ররা হানা দিতেই তারা দল ছেড়ে সরে পড়ল। বাধা দেওয়া দূরে থাক, "আল্লাহো আকবর" বলে তারা হানাদারদেরই দলে ভিড়ে গেল। কথায় বলে, যার খায় পরে তারই দাড়ি উপাড়ে। এই নিমকহারামেরাও হানাদারদের রাস্তা দেখিয়ে এগিয়ে আনতে লাগল রাজধানীর দিকে। মহারাজা উতলা হবেন না তো হবে কে?

দশহরার দিনে রাজা দরবারে না বসলেই নয়। এক শ' বছর ধরে চলে আসছে এ নিয়ম; মহারাজা গোলাব সিং-এর আমল থেকে। পিতা-পিতামহদের সে নিয়ম তো ভাঙা চলে না। তাই এবারও সভা ডাকতে হয়েছে।

দরবারে কুল-পুরোহিত মন্ত্র পড়লেন। ভাট গান বেঁধে রাজার মহিমা শোনালো। মনের উদ্বেগ চেপে রেখে রাজা কাউকে দিলেন সনদ, কাউকে দিলেন শিরোপা। সভাসদেরা একের পর একে রাজার পায়ের কাছে রাখল প্রণামী। কেউ পাঁচ মোহর, কেউ বা দুই,—যার যেমন

ঝিলম নদীর তীর

হার বাঁধা আছে বাপ-ঠাকুর্দার আমল থেকে। জমিদার জায়গিরদারেরা কেউ দিল আসমানী রঙের কল্কা পাড় পশমী জামিয়ায়, কেউ দিল ঝুড়ি-ভর্তি সুগন্ধ মৃগনাভী, কেউ বা দিল গিলগিটের নামকরা নীলু গাই-এর শিং।

হঠাৎ ব্যস্ত-সমস্তভাবে শহর কোটাল এসে ঢুকল দরবারে। চুপি চুপি কী যেন বলল নগরপালকে। নগরপাল আঁৎকে উঠে ফিসফিস করলেন তার উপরওয়ালার কানে। উপরওয়ালা অমনি কানে কানে বললেন তাঁরও উপরওয়ালাকে। তিনি গোপনে জানালেন মন্ত্রীকে, মন্ত্রী ভয়ে ভয়ে শোনালেন দেওয়ানকে। দেওয়ান মুখ কালো করে উঠে গিয়ে রাজাকে দিলেন দুঃসংবাদ।

শুনে মহারাজ হরি সিং-এর মুখে কথা সরল না খানিকক্ষণ। তারপর হঠাৎ আসন ছেড়ে উঠে দেওয়ানকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন বাইরে। এবার আর চতুর্দোলা নয়; শাঁ শাঁ শব্দে মোটর হাঁকিয়ে দিলেন নতুন রাজবাড়ির দিকে।

সভাসদেরা সবাই অবাক। এ ওর মুখের দিকে তাকায়। ব্যাপার কী? একটু পরেই জানতে পারা গেল। ব্যাপার গুরুতর। মন্দ খবর বাতাসের আগে ছোটে। শোনা গেল, ব্রিগেডিয়র রাজেন্দ্র সিংজী যুদ্ধে নিহত হয়েছেন। কী সর্বনাশ!

রাজেন্দ্র সিং ছিলেন মহারাজার প্রধান সেনাপতি। যেমন বীর, তেমনি সাহসী। তাঁর উপরেই মহারাজার

যা' কিছু ভরসা। কাশ্মীরের হিন্দুসৈন্য তখনও শ' দেড়েক বাকী ছিল। তাদের নিয়ে রাজেন্দ্র সিং এগিয়ে গিয়েছিলেন দুশমনদের রুখতে।

হানাদারেরা তখন শ্রীনগর থেকে পঁয়ষট্টি মাইল দূরে উরি অবধি এসেছে। সেখানে ঐ অল্প ক'টি মাত্র সৈন্য নিয়ে রাজেন্দ্র সিং পাকিস্তানীদের বাধা দিলেন। প্রাণের মায়া ছেড়ে লড়তে লাগলেন তিনি; লড়তে লাগল তাঁর সৈন্যরা। হানাদারেরা সংখ্যায় প্রায় দশ গুণেরও বেশী। অসাধারণ বীরত্বে রাজেন্দ্র সিং তাদের ঠেকিয়ে রাখলেন উরিতে পুরা দুটি দিন। তারপর নিজ সৈন্যদের সঙ্গে নিজেও মারা পড়লেন যুদ্ধে। দেড় শ' জন দেড় হাজারের বিরুদ্ধে লড়তে পারে কতক্ষণ?

রাজদরবার থেকে মুখে মুখে খবর ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেল, পথে লোক চলে না, ঘরে ঘরে মেয়ে-পুরুষ সবাই ভয়ে জড়সড়। কী জানি কী হবে আজ রাতটুকু পোহালে।

কিন্তু ততক্ষণও সময় পেল না তারা। রাত তখন দশটার কাছাকাছি। হঠাৎ শহরের সমস্ত আলো নিবে গেল। বিজলী আলোর কারখানাটা মহুরায়। পাহাড়ী ঝরনার জল ধরে জলবিদ্যুৎ তৈরী হয় সেখানে। থামের মাথায় তারের মধ্য দিয়ে সে-বিদ্যুৎ আসে দূর দূরান্তের শহরে। হানাদারেরা মহুরায় পৌঁছে কারখানার যন্ত্রপাতি ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে।

ঝিলম নদীর তীর

মহুরা ? সে-তো রাজধানী থেকে মাত্র পঞ্চাশ মাইল। চমকে উঠল সবাই। তবে শ্রীনগরের আর বাকী রইল কত ? পীচ-বাঁধানো চওড়া সড়ক গিয়েছে মহুরার গা দিয়ে। সে-পথে মোটর লরী বোঝাই হানাদারদের শ্রীনগরে এসে পৌঁছতে কতক্ষণ লাগবে ? তবে আর কিসের ভরসা ? সেই রাত্তিরেই শহর থেকে প্রাণের ভয়ে লোক পালাতে শুরু করল। মোটরে, লরীতে, টাঙায়, গরুর গাড়িতে, সাইকেল-এ বা ঘোড়ার পিঠে চেপে ছুটলো নানা দিকে। যাদের কিছুই জুটলো না, তারাও স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে পায়ে হেঁটে রওনা হলো নিরাপদ জায়গার খোঁজে।

রাজবাড়িতে হরি সিং দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে জিজ্ঞাসা করলেন, "দেওয়ান, এখন উপায় ?"

দেওয়ান হাত জোড় করে বললেন, "মহারাজ, উপায় একমাত্র ভারত সরকার। তাঁদের সাহায্য চান।"

এক বছর আগে পণ্ডিত নেহরুকে রাজ্যে ঢুকতে দেননি, কয়েদ করেছিলেন ; সে কথা রাজার মনে ছিল। সেই নেহরু এখন ভারত সরকারের কর্তা। রাজা চিন্তিত মুখে বললেন, "তাঁরা কি সাড়া দেবেন ?"

দেওয়ান উত্তর করলেন, "হুজুর, আর্তকে রক্ষা করা মানুষের ধর্ম ; তা' যদি না করেন তবে তাঁরা কেমন মহৎ ? অত্যাচারীকে বাধা দেওয়া ন্যায়ের বিধান ; তা' যদি না মানেন, তবে তাঁরা কিসের শাসক ? আপনি আবেদন করুন, আর দেরিতে সর্বনাশ হবে।"

ঝিলম নদীর তীর

তখন সেই অন্ধকার রাজপুরীর খাশ কামরায় লণ্ঠনের আলোতে বসে কাশ্মীরের শেষ মহারাজা হরি সিং নিজ হাতে পত্র রচনা করলেন। করুণ প্রার্থনা জানালেন ভারতের নতুন সরকারের কাছে। লিখলেন,—"এক্ষুণি সৈন্য-সামন্ত পাঠিয়ে কাশ্মীরকে রক্ষা করুন। দোহাই, তার চল্লিশ লক্ষ লোককে বাঁচান।"

সে-দিন তারিখটা ছিল ২৫শে অক্টোবর, ইংরেজী ১৯৪৭ সাল।

দুই

নয়াদিল্লীতে মহারাজার তার পেয়ে প্রধান মন্ত্রী নেহরু ভাবেন, কী করা যায় ?

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল সহকারী প্রধান মন্ত্রী। তিনি এবং অন্যান্য মন্ত্রীরা বললেন, তাড়াতাড়ি সৈন্য পাঠাতে হবে কাশ্মীরে ; হানাদারদের ঠেকাতে।

লর্ড মাউন্টব্যাটেন তখন বড়লাট। তাঁর খুবই আপত্তি। তবে তিনি এখন নিয়মতান্ত্রিক গভর্নর জেনারেল, নিজের মত খাটাতে পারেন না, শুধু উপদেশ দিতে পারেন। বললেন, "পাকিস্তানও যদি সরাসরি সৈন্য পাঠায় হানাদারদের পক্ষে, তবে ?"

ডাকা হলো সেনাপতি ও সৈন্যদলের কর্তাদের। তাঁরা সবাই ইংরেজ। এসে গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বললেন, কাশ্মীরে ভারতীয় সৈন্য পাঠানো বিপদের কথা।

মন্ত্রীসভা জোর দিয়ে বললেন, বিপদের ভয়ে মহারাজাকে সাহায্য না দেওয়া কাপুরুষতা। পাকিস্তানীরা জোর করে দখল করবে কাশ্মীর, এ কখনই হতে দেওয়া যায় না।

সে-কথা ঠিক। কিন্তু কাশ্মীর তো ভারতবর্ষে তখনও

যোগ দেয়নি। আইন মানতে গেলে কাশ্মীরকে রক্ষা করা তো ভারত সরকারের দায় নয়।

মহারাজা হরি সিং সে-কথা জানতে পেরে পর দিনই দলিল সই করে পুরোপুরি ভারতবর্ষে যোগ দিলেন।

তখন ভারত সরকার তাঁদের সেনাপতিকে হুকুম দিলেন কাশ্মীরে সৈন্য পাঠাতে।

দিল্লী থেকে কাশ্মীরে যাওয়ার একটি মাত্র রাস্তা। অনেক পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে, নদী-নালা পার হয়ে, বন-জঙ্গলের ভিতর দিয়ে সে-পথ। প্রায় তিন শ' মাইল। তারও এখানে ভাঙা, ওখানে মেরামতি। কোথাও এত খাড়া উঁচু যে, গাড়ি চলা দায়, কোথাও বা এত ভীষণ সরু যে, পাশাপাশি হাঁটা কঠিন। সে-পথ ধরে গেলে নুন আনতেই পান্তা ফুরোবে। ভারতীয় সৈন্য কাশ্মীরে পৌঁছবার আগেই হানাদারেরা তা' পুরোপুরি দখল করে নেবে। তাই আকাশ-পথে বিমানে সৈন্য পাঠানো ছাড়া অন্য গতি নেই।

দিল্লীর ছাউনিতে তখন যথেষ্ট সৈন্য নেই। বারো মাইল দূরে গুরগাঁয়ে শিখ রেজিমেণ্টের এক ব্যাটেলিয়ন সৈন্য ছিল। হুকুম পেয়ে রাত্রির অন্ধকারে তাদের কিছু এসে পৌঁছল পালমের বিমানঘাঁটিতে। তাড়াতাড়ি কোনো মতে সেখানে গোলা বারুদ, পোষাক পরিচ্ছদ দেওয়া হলো তাদের। ২৭শে অক্টোবর ভোরবেলা প্রভাতী তারাটি যখন সবে অস্ত গিয়েছে, দূরে খোলা

ঝিলম নদীর তীর

মাঠের শেষে পুবের অকাশে দেখা দিয়েছে একটুখানি আবছা আলোর আভা, তখন বিমানবহরের তিন তিনখানা ডাকোটা বিমানের পাখা এক সঙ্গে গর্জন করে উঠলো। শিখ সৈন্যদের নিয়ে নিমেষে আকাশ-পথে রওনা হলো শ্রীনগরের দিকে। স্বাধীন ভারতের সৈন্যদের এই প্রথম যুদ্ধযাত্রা।

সৈন্য তো রওনা হয়ে গেল। কিন্তু তারা শ্রীনগরে নামতে পারবে তো ? সেখানকার বিমানঘাঁটিটি এরই মধ্যে হানাদারেরা দখল করে বসেনি তো ? দিল্লীর সদর দপ্তরে সবার মনেই সেই ভাবনা। বেতার টেলিগ্রাফের ঘরে যন্ত্রপাতি নিয়ে বসে আছে লোক। হেডফোন কানে লাগিয়ে অপেক্ষা করছে খবর দেয়া-নেয়ার কর্মচারীরা। আধঘণ্টা পর পর বড়কর্তারা খোঁজ নিচ্ছেন, খবর এসেছে কি ? না, আসেনি। ন'টা বেজে গেল। তখনও খবর এল না। সাড়ে ন'টা বাজলো। বাজলো দশটা। কোনো খবর নেই ! দশটা পনের,—কুড়ি—পঁচিশ—ঘড়ির কাঁটাটা এগিয়ে যাচ্ছে মিনিটে মিনিটে। মিনিট তো নয়, মনে হয় যেন এক একটা যুগ। কারো মুখে কথা নেই, ঘরে নেই শব্দটি। একটা পিন পড়লেও বুঝি আওয়াজ শোনা যাবে। উদ্বেগে সবার যেন দম আটকে আসছে। এত দেরি হচ্ছে কেন ? তবে কি—? সাড়ে দশটা, দশটা একত্রিশ,—হঠাৎ বেতার যন্ত্রের বোর্ডে আলো জ্বলে উঠলো।

ঝিলম নদীর তীর

"হ্যালো, হ্যালো দিল্লী, হ্যালো,—দিস ইজ শ্রীনগর কলিং, হ্যালো—।" খবর এসেছে। ডাকোটা তিনটি নিরাপদে বিমানঘাঁটিতে নেমেছে। প্রথম ভারতীয় সেনাবাহিনী পৌঁচেছে কাশ্মীরে! হুর্‌রে!

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে দপ্তরের উপরওয়ালারা বললেন, "থ্যাঙ্ক গড। ভগবানের দয়া।"

তিন

যে শিখ সৈন্যরা আকাশ-পথে শ্রীনগরে পেঁছিল তাদের নেতা ছিলেন লেফটেনেণ্ট কর্নেল দেওয়ান রণজিৎ রায়। নামের শেষটা বাঙালীর মতো। তাই না? আসলে তিনি পাঞ্জাবী। লম্বায় প্রায় ছ' ফুট, ছত্রিশ ইঞ্চি বুকের ছাতি, হাতের কব্জি দুটি লোহার বাঁটের মতো শক্ত এবং চওড়া। দেখে মনে হয়,—হ্যাঁ, লড়াই করার যোগ্য একখানা চেহারা বটে!

কথা ছিল, তিনি তাঁর ঐ অল্প ক'জন সৈন্য নিয়ে বিমান-ঘাঁটিটা শুধু আগলে থাকবেন। যথেষ্ট সৈন্য আর গোলা বারুদ না পাওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ নয়।

বিমানঘাঁটিতে নেমে কাশ্মীরের অবস্থা শুনে এবং দেখে কর্নেল রায়-এর তো চক্ষুস্থির। শত্রু রাজধানী শ্রীনগরের কাছে বারমূলা শহর দখল করেছে। আর খানিকটা এগিয়ে এলেই পাহাড়ী এলাকা পার হয়ে গ্রামে, মাঠে ছড়িয়ে পড়ে চারদিক থেকে শ্রীনগরকে ঘিরে ফেলতে পারবে!

তাই তো। এখন করা কী? হানাদারেরা সংখ্যায় কত, কোন্ পথে আসছে, কী তাদের সাজ-সরঞ্জাম, সমস্তই অজানা। না জেনে-শুনে শ' খানেক সৈন্য নিয়ে শত্রুর

সঙ্গে লড়তে যাওয়ার বিপদ অনেকখানি। অথচ আরও সৈন্য আর অস্ত্রশস্ত্র এসে পৌঁছনোর অপেক্ষায় থাকলে শ্রীনগরের আশা শেষ। কঠিন সমস্যায় পড়লেন কর্নেল রায়।

বসে ধীরে-সুস্থে ভাববারই বা সময় কোথায়? এক মিনিট দেরি মানে হয় তো শত্রুকে এক গজ এগোতে দেওয়া। চটপট ঠিক করে ফেললেন কর্নেল রায়। দিল্লীর হুকুম যাই থাক, এই মুহূর্তে হানাদারদের ঠেকাতে না গেলে সবই হবে খতম। তিনি সৈন্যদের নিয়ে তৈরী হলেন।

আর এক সমস্যা দেখা দিল। সৈন্যরা যাবে কী করে? সঙ্গে না আছে মিলিটারী লরী, না আছে জীপ, না আছে অন্য কোনো রকমের গাড়ি বা ঘোড়া। শ্রীনগরের রাস্তায় যে মোটর বাসগুলি যাত্রী বা মাল বইতো, খুঁজে পেতে তারই কয়েকটা যোগাড় হলো কোনো মতে। তাই নিয়ে কর্নেল রায় আর তাঁর সৈন্যরা রওনা হলেন।

বারমূলার মাইল দুই পুবে আছে একটা ছোট পাহাড়। তার এক পাশ দিয়ে চলে গিয়েছে শ্রীনগরের পাকা সড়ক। দু' শ' গজ দূরে বইছে ঝিলম নদী। সেই পাহাড়ের চূড়ায় ঘাঁটি করলেন কর্নেল রায়। হানাদারেরা ঐ সড়কে এগিয়ে আসতেই হুকুম দিলেন,—"ফায়ার"।

শিখদের বন্দুকগুলি একসঙ্গে গর্জে উঠল—গুড়ুম, গুড়ুম, গুড়ুম!

ঝিলম নদীর তীর

উরি থেকে এই অবধি হানাদারেরা বিনা বাধায় এগিয়ে আসছিল। আচমকা গুলী খেয়ে প্রথমে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল। যারা সামনে ছিল তারা ঝড়ে উপড়ে-ফেলা কলাগাছের মতো ধপাস করে পড়ে পড়ে মরতে লাগল রাস্তার দু'পাশে। পিছনের লোকগুলি দিশেহারা হয়ে এদিকে ওদিকে ছিটকে পড়ল।

শেষে কিছুটা সামলে নিয়ে হানাদারেরাও পাল্টা আক্রমণ করল।

একটু পরেই কর্নেল রায় বুঝলেন, যা' শোনা গিয়েছে তা' সত্যি নয়। দিল্লীতে অনেকে ভেবেছে, হানাদার মানে হলো একদল গুণ্ডা। দা', কাটারি, বর্শা, বল্লম, বোমা, পটকা ও গাদা বন্দুক নিয়ে লুঠতরাজ করতে এসেছে বুঝি। মোটেই তা' নয়। এরা আজকালকার লড়াই-এর ফিকির-ফন্দি সব জানে। ইউনিট, সাব-ইউনিট অর্থাৎ আলাদা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে যুদ্ধ চালাবার কায়দা কৌশল শিখেছে এরা। ক্যাপ্টেন, মেজর, কর্নেল—এমনি সব শিক্ষিত কমাণ্ডার হচ্ছে দলের সর্দার। ব্রেনগান, স্টেনগান, হাল্কা ও মাঝারি মেশিনগান, হ্যাণ্ড গ্রেনেড, ট্যাঙ্কমারা রাইফেল—আরও সব বিলাতী হাতিয়ার আছে তাদের হাতে। লাল পাগড়ি বা সঙ্গীন উঁচন দেখলেই ভয়ে পালিয়ে যাবে, এ-সব দৈত্য নয় তেমন।

শিখ সৈন্যরা সংখ্যায় হানাদারদের কাছে নগণ্য। তবে পাহাড়ের মাথায় ঘাঁটি করার মস্ত একটা সুবিধা

আছে। আড়ালে লুকিয়ে গুলী ছোঁড়া যায়। সেই সুযোগ নিয়ে তারা বিপক্ষ দলকে ঘায়েল করতে লাগল।

অবিরাম যুদ্ধ চলল কয়েক ঘণ্টা। সূর্য অস্ত গিয়ে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। হঠাৎ কর্নেল রায় লক্ষ্য করলেন, পাহাড়ের অন্যদিক দিয়ে হানাদারদের একটা দল গুটি গুটি এগিয়ে আসছে। সর্বনাশ! শত্রু দু'দিক দিয়ে ঘিরে ফেললে শিখ সৈন্য যে একটিও জ্যান্ত রইবে না। তিনি বুঝলেন, তক্ষুণি সৈন্যদের অন্য জায়গায় সরিয়ে নিতে না পারলে রক্ষা নেই। হুকুম দিলেন তাদের পিছু হটতে।

বড় হাবিলদার পায়ে পায়ে ঠোক্কর দিয়ে ডান হাতে স্যালুট করে জিজ্ঞাসা করল, "হুজুর, আপ্? আপনি?"

কর্নেল একটু হেসে বললেন, গুলী চালিয়ে দুশমনদের কেউ আটকে না রাখলে তারা পিছু নেবে। তাই সব শেষে যাবেন তিনি। নিজের সৈন্যদলের শেষ লোকটিও নিরাপদে পার না হওয়া পর্যন্ত অধিনায়ককে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নড়তে নেই। এই হলো তাঁর মত। তিনি নিজ হাতে মেশিনগানের ঘোড়া টিপতে লাগলেন খট্ খট্ খট্ খট্ খট্···।

শিখ সৈন্যরা ধীরে ধীরে পিছনে সরতে লাগল। হানাদারেরা অবশ্য চুপ করে বসে নেই। তাদের বন্দুক থেকেও ঝাঁকে ঝাঁকে গুলী এসে পড়তে লাগল কর্নেল রায় আর তাঁর সেনাদলের চার পাশে। কিছু শিখ পড়ল মারা, কয়েকজন হলো জখম। ঘণ্টাখানেকের

মধ্যে বাকী সৈন্য হানাদারদের এড়িয়ে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছল।

সবার শেষে উঠে দাঁড়ালেন কর্নেল রায়। সেই মুহূর্তে অন্ধকার থেকে একটা গুলী এসে লাগল তাঁর কপালে। মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন তিনি। বীর রণজিৎ রায় বীরের মতোই যুদ্ধ করতে করতে মারা গেলেন যুদ্ধক্ষেত্রে।

বছর তের আগে দেরাতুনের মিলিটারী কলেজ থেকে পাশ করে সেকেণ্ড লেফটেনেণ্ট হয়ে রণজিৎ রায় ঢুকেছিলেন সেনাদলে। গত মহাযুদ্ধের সময় বর্মার জঙ্গলে জাপানীদের সঙ্গে লড়ে খুব নাম করেছিলেন। তাড়াতাড়ি প্রমোশন পেয়েছেন। উন্নতির ধাপে ধাপে হয়েছেন লেফটেনেণ্ট থেকে ক্যাপ্টেন, ক্যাপ্টেন থেকে মেজর, মেজর থেকে লেফটেনেণ্ট কর্নেল। আরও উপরে ওঠার আগেই মাত্র চৌত্রিশ বছর বয়সে জীবন শেষ হলো তাঁর। সব পাপড়িগুলি মেলার আগেই যেন শুকিয়ে গেল ফুলটি। পাক ধরার আগেই যেন বোঁটা থেকে খসে পড়ল গাছের কচি ফল।

সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনার আলো-ছায়া ঘেরা এই মর্তভূমি থেকে অকালে বিদায় নিলেন কর্নেল রায়। কিন্তু বাঁচিয়ে গেলেন শ্রীনগরকে। রক্ষা করলেন কাশ্মীর রাজ্যকে, নিরাপদ করলেন লক্ষ লক্ষ নরনারীকে। শিখ সৈন্যদের আক্রমণে হানাদারেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে

গিয়েছিল। সে-দিন আর এগিয়ে আসার সাধ্য ছিল না তাদের।

মরেও অমর হয়ে রইলেন কর্নেল রায় আর তাঁর সঙ্গীরা। বারমূলার পথে আজ যারা যাতায়াত করে তাদের চোখে পড়ে রাস্তার ধারে ছোট পাহাড়টির গায়ের কাছে একটি স্মৃতিফলক। একটি কাঠের বোর্ড। তাতে ইংরেজীতে লেখা—

"ভারতের সেই সব বীর শিখ সৈন্যদের কথা চিরকাল মনে থাকবে, যারা কাশ্মীরের স্বাধীনতা রক্ষায় ১৯৪৭ সালের ২৭শে অক্টোবর প্রথম এইখানে হানাদারদের রুখতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে।"

কাশ্মীরে আরও আছে একটি ছোট্ট স্মৃতিস্তম্ভ। পাথরের মনুমেণ্ট। তার চারদিক কাঠের রেলিং দিয়ে ঘেরা। ইংরেজীতে কী লেখা আছে তা' না পড়লেও চলে। কারণ লেখাপড়া শেখেনি এমন যে অজ পাড়াগাঁয়ের চাষী সে-ও জানে, এই স্মৃতিস্তম্ভটি কার জন্যে। মাথা নীচু করে হাত কপালে ঠেকিয়ে বলে, "কর্নীল রায় বাবর থে। ওয়ে ওহি থে জিন্‌হোনে হামকো বচায়া। কর্নেল রায় মহাবীর ছিলেন। তিনিই তো আমাদের বাঁচিয়েছেন।"

চার

করাচী প্রাসাদ কুটে, হোথা বারবার বাদশাজাদার তন্দ্রা যেতেছে টুটে।

আসলে কিন্তু করাচী নয়,—য়্যাবটাবাদ এবং তন্দ্রা নয়,—স্বপ্ন। পাকিস্তানের শাহেনশা জনাব জিন্নার বহুকালের স্বপ্ন। স্বপ্নরাজ্য কাশ্মীর। এতদিনে আসছে বুঝি তাঁর অধীনে। 'বুঝি' আর কেন?—একেবারে নিশ্চিত। হাতের মুঠিতে বললেই হয়। হাজার হাজার হানাদারদের দেওয়া হয়েছে হরেকরকম হাতিয়ার। দেওয়া হয়েছে অসংখ্য মোটর লরী, ট্রাক ও গ্যালন গ্যালন পেট্রোল। তারা এরই মধ্যে পৌঁছে গিয়েছে পাটানে। সেখান থেকে এগিয়ে যাবে শ্রীনগর। যেন রিষড়া থেকে কোন্নগর, বেহালা থেকে ডালহৌসি স্কোয়ার।

নয়া বাদশাহ তাই চলে এসেছেন করাচী থেকে য়্যাবটাবাদ। এগিয়ে এসে অপেক্ষা করছেন মাঝ পথে। সামনেই ইসলামের সব চেয়ে বড় পরব। রমজানের রোজার শেষে ঈদ। সেই পুণ্য দিনে হজরত মহম্মদের নাম স্মরণ করে বিজয়গর্বে শ্রীনগরে প্রবেশ করবেন পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহৎ ইসলাম রাষ্ট্র পাকিস্তানের জনক

ঝিলম নদীর তীর

কায়েদ-এ-আজম মহম্মদ আলী জিন্না। হজরতবাল মসজিদের জমায়েতে প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে পড়বেন নামাজ।

কিন্তু হঠাৎ এ কী খবর! হানাদারদের এগোবার পথে পড়েছে কাঁটা? শ্রীনগরের কাছে তাদের বাধা দিয়েছে ভারতীয় সৈন্যদল? এ যে ঘাটের কাছে নৌকাডুবি, ল্যাণ্ডিং-এর মুখে এয়ার ক্র্যাশ! বিশ্বাস হতে চায় না যেন।

দুর্গম পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে কোনোখান থেকে কোনো সাহায্য এসে পেঁছবার আগেই মহারাজের সিপাই বরকন্দাজ হবে নিকাশ, লোক লস্কর হবে নিশ্চিহ্ন, অনায়াসে পাকিস্তানী নিশান উড়বে শ্রীনগরের সরকারী দপ্তরখানার চূড়াতে—এই ছিল পাকিস্তানের ধারণা। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আকাশ পথে ভারতীয় ফৌজ এসে নামবে কাশ্মীরে, রুখবে হানাদারদের—এমন সম্ভাবনা ছিল পাকিস্তানী কর্তাদের গোণাগুণতির বাইরে।

এত বড় আশাভঙ্গ জিন্নার জীবনে এর আগে আর ঘটেনি। তাঁর ক্রোধের আর সীমা পরিসীমা রইল না। পাঞ্জাব-গভর্নরের মিলিটারী সেক্রেটারীকে ডেকে বললেন—

"প্রধান সেনাপতি জেনারেল গ্র্যাসীকে টেলিফোন করো এই মুহূর্তে। আমার হুকুম। এই দণ্ডে পাকিস্তানের সমস্ত সৈন্য নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করুক কাশ্মীরে।"

ঝিলম নদীর তীর

শুনে সেনাপতির চক্ষুস্থির। এ কী অদ্ভুত আদেশ। ব্রিটিশ আমলের ইংরেজ কর্মচারীরা প্রায় সবাই ভারতবর্ষের শত্রু। ভারতে ইংরেজ প্রভুত্বের অবসান ঘটিয়েছে ভারতীয় কংগ্রেস। সেই কংগ্রেস যাতে ধ্বংস হয় তাতেই তাঁদের আনন্দ। কিন্তু আর যাই হোক, তাঁদেরও কাণ্ডজ্ঞান আছে। তাঁরা জানেন, পিছনে থেকে অস্ত্র-শস্ত্র, সাজ-সরঞ্জাম ও বুদ্ধি-ব্যবস্থা দিয়ে হানাদারদের সাহায্য করা এক, প্রকাশ্যে যুদ্ধে নামা আর। বেগতিক দেখে গ্র্যাসী সবিনয়ে বললেন,—

"ইওর এক্সেলেন্সী, আমি তো, অকিনলেকের অধীন। তাঁর মারফতে আদেশ না পেলে করি কী?"

কথাটা ঠিক। দেশ বিভাগের সময় দু'পক্ষের সম্মতি নিয়ে দু' দেশেরই সামরিক সর্বাধিনায়ক হয়েছেন অকিনলেক। ভারত ও পাকিস্তানের দুই পৃথক কমাণ্ডার-ইন-চীফ লেফটেনেণ্ট জেনারেল সার রব লকহার্ট ও ডগলাস গ্র্যাসী। তাঁদের উপরে এক যুক্ত সুপ্রিম কমাণ্ডার,—ফিল্ড মার্শাল সার ক্লড অকিনলেক।

খবর পেয়ে অকিনলেক তাড়াতাড়ি বিমানযোগে গেলেন লাহোরে। জিন্নাকে বললেন, কাশ্মীরে পাকিস্তানের সৈন্য পাঠানো মানেই, ভারতবর্ষের সঙ্গে যুদ্ধ। তাতে সর্বনাশ।

জিন্নার যুক্তি,—হিন্দুস্থানের ফৌজ এসেছে কাশ্মীরে হিন্দু মহারাজার পক্ষে। কাজেই পাকিস্তানের সৈন্য যাবে সেখানকার মুসলমানের সাহায্যে।

ঝিলম নদীর তীর

অকিনলেক বললেন, "কাশ্মীর দলিল সহি করে যোগ দিয়েছে ভারতবর্ষে। সুতরাং কাশ্মীর এখন ভারতবর্ষেরই অংশ, তাকে রক্ষা করা ভারত সরকারেরই দায়িত্ব। সেখানে ভারতীয় সৈন্য লড়তে যাওয়া সম্পূর্ণ আইনসঙ্গত।"

"দলিল ? সে তো মিথ্যে বাহানা। স্রেফ জোচ্চুরি। কাশ্মীরের ভারতে যোগ দেওয়া একটা সাজানো কারসাজি।" গর্জে উঠলেন জিন্না সাহেব।

অনেক বুঝিয়ে শুনিয়ে শেষকালে অকিনলেক ঠাণ্ডা করালেন জিন্নাকে। কাশ্মীরে পাকিস্তানী সৈন্য পাঠাবার হুকুম রদ করলেন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল। অকিনলেকেরই পরামর্শে চিঠি লিখলেন মাউন্টব্যাটেনকে। তিনি ও নেহরু আসুন লাহোরে। তাঁরা তিনজনে আলাপ আলোচনা করে একটা মীমাংসা করবেন কাশ্মীর সমস্যার।

নরম চিঠির সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু খবরের কাগজে দিলেন এক গরম বিবৃতি। 'ভারতভুক্তি'র ধাপ্পা দিয়ে ভারত সরকার কাশ্মীর দখল করেছে। পাকিস্তান তা' কোনো দিন মেনে নেবে না। হিন্দুস্থানী বন্দুকের জোরে সেখানকার মুসলমানদের দাবিয়ে রাখা চলবে না, চলবে না।

দিল্লীতে মন্ত্রীসভার সদস্যরা শক্ত হলেন। চিঠি পেয়ে বললেন, "সমস্যা ? কিসের সমস্যা ? কাশ্মীরে হামলা ? যারা হানাদারদের পাঠিয়েছে তারা তাদের ফিরিয়ে নিলেই তা' মিটে যায়। তার জন্যে আলাপের দরকার কী ? আলোচনারই বা অবকাশ কোন খানে ?"

মাউণ্টব্যাটেন অবশ্য আপোষের জন্যে ব্যগ্র। যে-ভাবেই হোক। তিনি চান, জিন্নার নিমন্ত্রণ রাখতে।

মন্ত্রীসভার সদস্যদের মধ্যে কেউ কেউ ব্যঙ্গ করে বললেন, "হ্যাঁ, নিমন্ত্রণই বটে। ধরনটা যে বড়ই চেনা চেনা ঠেকছে! নেহরুর অবশ্য ছাতা নেই, জিন্নারও নেই আধটুকরো গোঁফ, তবুও মিউনিক পর্বের সঙ্গে ব্যাপারটা মিলে যাচ্ছে না কি? গদেসবার্গ আর লাহোর,—এ'-দু-এর তফাৎ তো শুধু নামে।"

এ-কথার জবাব দেওয়া কঠিন।

অবশেষে অনেক যুক্তিতর্কের পর ঠিক হলো নেহরু নয়, একা মাউণ্টব্যাটেন যাবেন লাহোরে।

পাঞ্জাবের লাটপ্রাসাদে দুই গভর্নর জেনারেলের সাক্ষাৎ।

নমস্কার ও কুশল বিনিময়ের পরে জিন্না বললেন, "ভারত সরকার যে কাশ্মীরে সৈন্য পাঠাতে যাচ্ছে পাকিস্তানকে তা' সময় মতো জানানোই হয়নি।"

মাউণ্টব্যাটেন বললেন, "সে কী কথা? মন্ত্রীদের যে-সভায় বিমানে সৈন্য পাঠাবার সিদ্ধান্ত হয়, সে-সভা থেকে বেরিয়ে নেহরু প্রথমেই যা' করেছেন, তা' হচ্ছে পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী লিয়াকৎ আলীকে টেলিগ্রাম।"

জিন্না তখন অন্য কথা পাড়লেন। সোজা প্রশ্ন

করলেন, "পররাজ্যে ভারত সরকার সৈন্য পাঠায় কোন্ সাহসে ?"

মাউণ্টব্যাটেন জবাব দিলেন, "ইনস্ট্রুমেণ্টস অব য়্যাকসেসান, 'ভারতভুক্তি'র অধিকারে।"

জিন্না গম্ভীর হয়ে বললেন, "ভারতভুক্তি সে তো নিছক ছল।"

মাউণ্টব্যাটেন বললেন, "না, পুরোপুরি সত্য।"

জিন্না ব্যঙ্গ করে বললেন, "ওঃ, কাশ্মীরের পঁচিশ লক্ষ মুসলমান দরখাস্ত করেছে বুঝি ভারত সরকারের কাছে ?"

মাউণ্টব্যাটেন বললেন, "আইনে তার দরকার হয় না। মহারাজা স্বয়ং দস্তখৎ করেছেন দলিলে।"

জিন্না বললেন, "মহারাজা ? তিনি সহি করার কে ? কোন্ দেশীয় রাজ্য ভারতবর্ষে আর কোন্ রাজ্য পাকিস্তানে যোগ দেবে তা' ঠিক করার একমাত্র মালিক হলো সেখানকার জনগণ।"

মাউণ্টব্যাটেন নীরবে একটু শুধু মুচকি হাসলেন। মনে মনে বোধহয় বললেন, সে কী কথা, মিস্টার জিন্না, এই কিছুদিন আগে জুনাগরের বেলায় আপনারাই তো বলেছিলেন যে, যোগদানের ব্যাপারে নবাবের ইচ্ছাই হলো আইনত শেষ কথা।

জিন্নাও বোধহয় বুঝলেন মাউণ্টব্যাটেনের হাসির অর্থ। কড়া সুরে বললেন, "কাশ্মীরের 'ভারতভুক্তি' আমরা

কোনো কালেই মানবো, না। তার পিছনে আছে বলপ্রয়োগ, গায়ের জোর।"

মাউণ্টব্যাটেন শান্তভাবে বললেন, "খুব খাঁটি কথা। সে-বল প্রয়োগ করেছে হানাদারেরা। গায়ের জোর খাটিয়েছে আক্রমণকারীরা। তার দায়িত্ব পাকিস্তানের।"

ঘুরে ফিরে ঐ একই উক্তি ও একই যুক্তি। একই অভিযোগ এবং একই উত্তর।

এমনি করে কেবল কথা কাটাকাটি চললো দুই গভর্নর জেনারেলের মধ্যে।

অবশেষে জিন্না বললেন, "আচ্ছা, আসুন একটা মিটমাট করা যাক। দু'পক্ষই অবিলম্বে একই সঙ্গে কাশ্মীর থেকে চলে আসুক।"

মাউণ্টব্যাটেন বললেন, "ভারতবর্ষ তাদের সৈন্য ফিরিয়ে আনবে কাশ্মীর থেকে, সে না হয় বোঝা গেল। কিন্তু হানাদারদের ফেরাবে কে?"

জিন্না বললেন, "আপনি ভারতীয় সৈন্য ফিরিয়ে আনলেই, হানাদারদের হামলা থামাবার ব্যবস্থা আমি করবো।"

বটে! তবে যে এতদিন পাকিস্তান বলে আসছে,—কাশ্মীর আক্রমণ সীমান্তের উপজাতীয়দের কাজ। হানাদারদের উপরে পাকিস্তানের কোনো হাত নেই! সেটা তা' হলে শুধু বাইরে প্রচারের জন্যে। ভিতরে আসল কথাটা স্বীকার করতে তেমন আপত্তি নেই!

ঝিলম নদীর তীর

আলোচনা শেষ হলো। তর্কের শেষ হলো না। মীমাংসা হলো না সমস্যার। দুই নবগঠিত রাষ্ট্রের বিরোধ রইল অবিদূরিত।

মাউন্টব্যাটেন ও জিন্না একে অন্যের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। আন্তরিক হৃদ্যতায় নয়, মৌখিক ভদ্রতায়।

পাঁচ

এবার কাশ্মীর যুদ্ধের সেনাপতি হয়ে এলেন একজন বাঙালী। ব্রিগেডিয়র এল. পি. সেন। লাবণ্যপ্রসাদ বা ললিতপ্রসন্ন নয় কিন্তু। লাওনেল প্রতীপ সেন। নামটা পুরোপুরি স্বদেশী নয়, তার কারণ লাওনেল প্রতীপের জন্মও স্বদেশে নয়। তাঁর বাবা ছিলেন ব্রহ্মদেশের এক নামকরা ব্যারিস্টর। লাওনেল জন্মেছেন রেঙ্গুনে। পড়াশুনা করেছেন সেখানকার সাহেবী কনভেণ্টে। বিলাতের স্যাণ্ডহার্স্ট থেকে যুদ্ধবিদ্যা শিখে ভারতীয় সেনাবিভাগে অফিসার হয়েছেন গত মহাযুদ্ধের কয়েক বছর আগে।

ডিস্টিংগুইসড সার্ভিস অর্ডার সেনাদলের খুব উঁচু খেতাব। খুব বীরত্ব না দেখালে মেলে না। গত যুদ্ধে ব্রিগেডিয়র সেন ছিলেন দশ নম্বর বালুচ রেজিমেণ্টের সেনানায়ক। বর্মায় কংগ-এর জঙ্গলে জাপানীদের নির্মূল করে তিনি সেই সেরা খেতাব পেয়েছিলেন।

শ্রীনগরে এসে ব্রিগেডিয়র সেন দেখেন, শত্রু চায় রাজধানীকে দু'দিক দিয়ে ঘিরে ফেলতে। একদল হানা দিচ্ছে সমুখ থেকে। আসছে বারমূলা হয়ে পীচ-বাঁধানো

পথে। মোটর লরীর মাথার চাঁদ-তারা মার্কা সবুজ ঝাণ্ডা উড়িয়ে। আর একদল আক্রমণ করছে বাঁ পাশ থেকে। তারা আসছে গুটি গুটি পায়ে হেঁটে গাঁয়ের পথ বেয়ে। দুটো জোরালো জঙ্গীদল। যেন সাঁড়াশীর মুখে দু'পাটি ধারালো দাঁত। দু'পাশ থেকে শহরটাকে চেপে ধরবে শক্ত কামড়ে। চিবিয়ে গিলে ফেলবে ধীরে ধীরে।

ব্রিগেডিয়র সেন বুঝলেন, প্রথমে চাই দিন কয়েকের সময়। আপাতত চাই হানাদারদের কিছু দিন ঠেকিয়ে রাখা। তাড়িয়ে দেওয়ার কথা হবে পরে।

সবার আগে হলো শ্রীনগরের বিমানঘাঁটিটি। শহরের মাইল আটেক বাইরে এই বিমানঘাঁটিটিই এখন কাশ্মীরের সঙ্গে ভারতের একমাত্র যোগাযোগ। ঘরের যেমন দোর, নদীর যেমন ঘাট। হাত ছাড়া হলে যাওয়া-আসারই পথ রইবে না আর।

আকাশ-পথে গাড়োয়ালী সৈন্যদের এক রেজিমেণ্ট এসে পোঁচেছিল শ্রীনগরে। তাদেরই এক দলকে মোতায়েন করলেন ব্রিগেডিয়র সেন বিমানঘাঁটির পাহারায়। বন্দুক কাঁধে নিয়ে তারা টহল দিতে লাগলো সর্বক্ষণ। পাশ না দেখালে ঢুকতে দেয় না জনপ্রাণীকে। কেউ কাছে ঘেঁষেছে কি অমনি বাজখাঁই আওয়াজে হাঁক দিয়ে শুধোয়,— হু-কুম-দার্—? শুনে পীলে চমকে ওঠে সবার।

দিন কাটে তো, রাত কাটে না। ভোর হওয়ার আগেই হানাদারদের আনাগোনা শুরু হয় বাদ্গামে।

ঝিলম নদীর তীর

গ্রামটা বিমানঘাঁটি থেকে আধ মাইল মাত্র দূর। চেঁচালে গলা শোনা যায়। আগুন জ্বালালে ধোঁয়া দেখা যায়। এত কাছে।

যুদ্ধ বেধে গেল। একেবারে হাতাহাতি লড়াই। একদিকে পাকিস্তানী হানাদার, অন্যদিকে গাড়োয়ালী সৈন্য। কণ্ঠ আকড়ি' ধরিল পাকড়ি' দুই জনা দুই জনে।

শত্রুদলে প্রায় সাত শ'। তারা হ্যাণ্ড গ্রেনেড আর ব্রেনগান নিয়ে আক্রমণ করছে। গাড়োয়ালীরা সংখ্যায় তার অর্ধেক। তারা চালাচ্ছে রাইফেল। চার ঘণ্টা ধরে চলল তুমুল হানাহানি। গোলার ধোঁয়ায় আকাশ হলো কালি, গুলীর শব্দে কানে লাগলো তালা। নিহত আর আহতদের রক্ত ঝরে' জমিন হলো রাঙা।

হানাদারেরা মরীয়া হয়ে সমুদ্রের ঢেউ-এর মতো জোরে বার বার ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগলো গাড়োয়ালীদের উপরে। তীরে ঘা-খাওয়া ঢেউ-এর মতোই বার বার ফিরে যেতে হলো তাদের। গাড়োয়ালীদের একচুল হটাতে পারল না তাদের জায়গা থেকে।

খবর পেয়ে ব্রিগেডিয়র সেন শ্রীনগর থেকে তাড়াতাড়ি আরও সৈন্য আর অস্ত্রশস্ত্র পাঠিয়ে দিলেন। ততক্ষণে হানাদারেরা হাঁপিয়ে উঠেছে। নতুন সৈন্যের মহড়া নেওয়ার সাধ্যি নেই। নিমেষের মধ্যে শ' দুই হানাদার গেল মারা। বেগতিক দেখে তারা পালিয়ে যেতে লাগলো। বিমানঘাঁটিটির আর কোনো আশঙ্কা রইল না।

ঝিলম নদীর তীর

বাদগামের জয়লাভ গাড়োয়ালীদের এক মস্ত বড় কীর্তি। কিন্তু এই যুদ্ধে তাদের সেনানায়ক মেজর সোমনাথ শর্মা নিহত হলেন। সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে নিজ সৈন্যদের তিনি পরিচালনা করছিলেন। যুদ্ধ জয়ের আনন্দ অনেকখানি মলিন হয়ে গেল তাঁর শোকে।

শোকে কাতর হয়ে বসে থাকার উপায় থাকে না সেনাপতিদের। রোগীর মৃত্যুতে উতলা হলে ডাক্তার চিকিৎসা করবে কখন? ব্রিগেডিয়র সেনও মন দিলেন কাশ্মীরের রক্ষা ব্যবস্থায়। খোলা মাঠে তাঁবু খাটিয়ে তৈরী হলো সৈন্যদের ব্যারাক, বালির বস্তা সাজিয়ে অস্ত্রাগার। দেবদারু গাছের গুঁড়ি খাড়া করে টেলিফোনের তার খাটানো হলো এ-দপ্তর থেকে ও-দপ্তরে।

সৈন্য। বেশী সৈন্য। আরও বেশী সৈন্য চাই কাশ্মীরে। পাঠাতে হবে আকাশ-পথে। পাঠাতে হবে অবিলম্বে। কিন্তু এত বিমান মিলবে কোথায়? তাই তো! দিল্লীতে যুদ্ধ দপ্তরের বড়কর্তারা ভেবে কূল পান না।

হঠাৎ খেয়াল হলো। অনেকগুলি বেসামরিক বিমান কোম্পানী রয়েছে যে দেশে। তারা কলকাতা, বোম্বাই, দিল্লী, গৌহাটি প্রভৃতি বড় বড় শহর থেকে আকাশ-পথে যাত্রী আর মাল আনা-নেওয়া করে প্রত্যহ। একুনে তাদের প্রায় শ' খানেক বিমান আছে। বেশীর ভাগই ডাকোটা। সরকারী হুকুমে রাতারাতি সবগুলি বিমান জড়ো করা হলো নয়া দিল্লীতে। পালম আর সফদারজঙ্গ

ঝিলম নদীর তীর

—এই দুটি বিমানঘাঁটি থেকে সেগুলি খেয়া নৌকার মতো ঘণ্টায় ঘণ্টায় সৈন্য আর লড়াই-এর সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে আসা-যাওয়া করতে লাগলো শ্রীনগরে।

পাইলট, রেডিও অফিসার, গ্রাউণ্ড এঞ্জিনীয়র, ক্রু, কারুরই বিশ্রাম নেই এতটুকু। ভোর হতে না হতেই শুরু হয় বিমানগুলির আকাশে ওড়ার পালা। সন্ধ্যায় একে একে ফিরে আসে মাটিতে। দিন শেষ হয় বটে, কাজ শেষ হয় না। তক্ষুণি আরম্ভ হয় আবার পরের দিনের উদ্যোগ আয়োজন। সারারাত কুলীরা মাথায় বয়ে বোঝাই করে মাল, কর্মচারীরা ফর্দ করে জিনিষপত্রের। ফিটার মিস্ত্রীরা তেল ন্যাকড়া দিয়ে ঘষা-মাজা করে বিমানের কলকব্জা, ইঞ্জিন প্রপেলর ইত্যাদি। নাওয়া-খাওয়ার সময় থাকে না অনেকের। মেলে না দু'দণ্ড নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমিয়ে নেওয়ার ফুরসৎ। দিনের পর দিন বিমান কর্মচারীদের এমন হাসিমুখে একটানা কাজ করার ক্ষমতা দেখে সবাই অবাক হয়। প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে বলে, "মানুষ তো নয় এরা ; এক একটি কল!"

কলের মতোই নিখুঁত নিয়মে চলতে লাগলো সরবরাহের কাজ। বিমানপথে শ্রীনগরে পৌঁছতে লাগল বাক্স-বন্দী বোমা, বন্দুক, বস্তা-বোঝাই রসদ। দলে দলে আসতে লাগলো সৈন্য সামন্তেরা। হেমন্তের শেষে হিমালয়ের কোলে মানস সরোবর থেকে যেমন সমতল ভূমিতে উড়ে আসে সারস, তিতির আর হংস-মিথুনের ঝাঁক।

ঝিলম নদীর তীর

রোগের মতো উৎসাহটাও ছোঁয়াচে। একজনকে দেখলে আর একজনের বুক উঁচু হয়ে ওঠে। বিমান-বাহিনীর লোকেরা যদি এত যোগ্যতা দেখাতে পারে তবে সাঁজোয়াবাহিনীর লোকেরা পিছনে পড়ে থাকবে নাকি? কখনও নয়। তারা উপরওয়ালাদের কাছে প্রার্থনা জানালো, হুকুম পেলে এক ডিভিসন আরমার্ড কার তক্ষুণি রওনা হতে পারে কাশ্মীরে।

আরমার্ড কারগুলি কামান বসানো মোটর গাড়ি। চারদিকে মোটা লোহার পাতে ঘেরা; যেমন তাদের কামানের দূর পাল্লা, তেমনি তাদের দ্রুতগতি। শত্রু ছত্রভঙ্গ হয় তাদের দাপটে।

কিন্তু যে-পথে সৈন্য চলা দায়, সে-পথে আরমার্ড কার যাবে কেমন করে? ঘন জঙ্গলে আটকে যাবে হয় তো উপরের ছাদ। পাথরে পিছলে যাবে নীচের চাকা। কামানের ভারে গুঁড়িয়ে যাবে নদী নালার উপরে হাল্কা কাঠের মতো সাঁকো।

তখন স্যাপার্স আর মাইনার্স দলের লোকেরা এগিয়ে এসে বলল, তারা থাকবে সাঁজোয়া গাড়ির সামনে। আগের ভাগে গাছ কেটে বন সাফ করবে, পাহাড় কেটে পথ।

"এম. ই. এস."-এর লোকেরা সব এঞ্জিনীয়র। তারাই বা কম যাবে কেন? সেলাম করে জানালো, তারা বাঁধবে খাদের ধার, গড়বে নতুন শক্ত পুল। ব্যস।

ঝিলম নদীর তীর

আর কথা কী? সেই রাত্রে দিল্লী থেকে রওনা হলো তারা।

পাঠানকোটের মাঠ ছাড়িয়ে, পীর পঞ্জলের চূড়া ডিঙিয়ে, বানিহালের সুড়ঙ্গ-পথ ঘর্ঘর শব্দে পেরিয়ে একদিন সকাল বেলা শ্রীনগরে এসে পৌঁছল ছোট একটি সাঁজোয়া-বাহিনী। লাইনবন্দী আরমার্ড কার। দেখে শহরের ছেলে বুড়ো সবার বুকে এল বল, মনে জাগলো আশা, মুখে ফুটলো হাসি। রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে তারা মুহুর্মুহুঃ জয়ধ্বনি করতে লাগলো। "ভারত মাতা-কী জয়!" "জয়, পণ্ডিতজী-কি!"

ছয়

অক্টোবর মাসের বাকী দিন ক'টা শেষ হয়ে গেল। এল নভেম্বর। শীতের আমেজ দেখা দিল কাশ্মীরে। হরি পর্বতের গায়ে লাগলো কুয়াশার প্রলেপ। নাশিমবাগে চেনারের পাতা হলো পীতাভ। পথের ধারে ফল-ঝরা আখরোটের শাখাগুলি শূন্য। ডাল্ হ্রদের জলে পানকৌড়িদের ডুব-সাঁতারের খেলাও হয়েছে সাঙ্গ। তীরে ডানা মেলে বসে কুঁড়ে বাদশা'র মতো তারা এখন শুধু রোদ পোহায় সারা তুপুর।

সে-দিন শুক্রবার। ৭ই নভেম্বর। রাত তখনও শেষ হয়নি। ব্রিগেডিয়র সেন হুকুম দিলেন, "ফরোয়ার্ড মার্চ! এগিয়ে চল।"

গত ক'দিন ধরে ব্রিগেডিয়র সেন এবং তার সহযোগীরা মিলে আক্রমণের তোড়জোড় সম্পূর্ণ করেছেন। শ্রীনগরের আশেপাশে কেবলই ছোট ছোট পাহাড়। তার আড়ালে কোন্‌খানে জড় হয়েছে শত্রুদল; বন-বাদাড়ের মাঝে কোথায় আছে পথ, কোথায় আছে খাদ,—তার খবর যোগাড় করেছেন গোপনে। মাইল মেপে এঁকেছেন

রাস্তা-ঘাটের নক্সা। এতদিন ভারতীয় সৈন্যদের ছিল আত্মরক্ষার লড়াই। এবার এসেছে আক্রমণের পালা।

পাটান থেকে শ্রীনগরের পথে হানাদারদের আস্তানায় বেশীর ভাগ তখনও ঘুমে বেঘোর। দু'চার জন মাত্র আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসেছে। এমন সময়, "হারে রে রে রে—।"

হানাদারদের সর্দার তখনও বিছানায়। এ ক'দিনের লুটের আনন্দে তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা যেমন মশগুল; জয়-লাভের আশায় তিনি নিজেও তেমনি খোশ মেজাজ। বাদগামের যুদ্ধের পরে এ পর্যন্ত ভারতীয় সৈন্যদের আর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যায় নি। বিনাবাধায়-ই হানাদারেরা ক্রমশঃ এগিয়ে এসেছে বারমূলা থেকে পাটান। পাটান থেকে সেলাটং। শ্রীনগর শহরের প্রায় দোর গোড়ায়। এখন রাজধানী শ্রীনগর তাদের নাগালে। ঠিক যেন গাছের নীচু ডালে ঝুলছে লাল টুকটুকে পাকা আপেলটি। শুধু হাত বাড়িয়ে তুলে নেওয়ার অপেক্ষা। অনেক রাত জেগে সর্দার তাই ইয়ার-দোস্ত নিয়ে আমোদ ফুর্তি করেন। কখনও মনের সুখে গোঁফে লাগান চাড়া। কখনও বা গন্ধ-ভরা রুমাল নিয়ে হাতে সহস্রবার দাড়িতে দেন ঝাড়া।

শেষ রাত্রির দিকে সর্দারের ঘুমটা জাঁকিয়ে এসেছিল। স্বপ্ন দেখছিলেন।—যেন শ্রীনগর দখল করে মহারাজাকে কোতল করেছেন। মহারাণীকে করেছেন বাঁদী। তাকিয়া

ঝিলম নদীর তীর

ঠেস দিয়ে সোনার গড়গড়ায় রূপোর নলে অম্বুরি তামাকের ধোঁয়া খাচ্ছেন আরামে। হঠাৎ শোনেন, "হারে রে রে রে—।"

ভারতীয় বাহিনী আক্রমণ করেছে ভীষণ বেগে।

চমকে উঠে বসে বললেন, "অ্যাঁ, যুদ্ধ? সে কী?"

চোখ রগড়ে চারদিকে তাকিয়ে শেষটায় হাঁক দিলেন, "বন্দুক লাও।"

লাও তো বটে! কিন্তু আনে কে? হট্টগোলের মধ্যে হানাদারেরা কেউ খুঁজছে হাতিয়ার, কেউ খুঁজছে পোষাক, কেউ বা দিশেহারা হয়ে অনর্থক ছুটোছুটি করতে গিয়ে নিজেদের মধ্যেই কপালে খেল ঠোক্কর, মাথায় পেল চোট। ব্যাপারটা ভালো করে বুঝতে পারার আগেই কচুকাটা হয়ে গেল অনেকে।

ব্রিগেডিয়র সেন আগের ভাগে একদল সৈন্যকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন উত্তরে, আর একদলকে দক্ষিণে। মাঝখানে ছিল মূল পদাতিক বাহিনী। ত্রিভুজের তিনটে বাহুর মতো তিন দল সৈন্য একসঙ্গে আক্রমণ করল হানাদারদের।

তিনদিক দিয়ে ঘেরাও হয়ে লড়াই করা চলে কতক্ষণ? কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই হানাদারেরা কাবু হয়ে পড়ল। তার উপরে—।

এ কী, মেশিনগানের আওয়াজ শোনায় যেন! হানাদারেরা অবাক হয়ে এদিকে ওদিকে তাকায়। ওমা,

তাই তো। এ যে সাঁজোয়া গাড়ি! সর্বনাশ !! ঘর্ঘর শব্দে ছুটে আসছে পথের ধুলো উড়িয়ে, কামানের ধোঁয়া ছড়িয়ে। গুলী ছুঁড়ছে যেন শিলাবৃষ্টি! "ইয়া আল্লা" বলে হানাদারেরা তখন দিল সোজা চম্পট। দৌড়, দৌড়, চোঁচা দৌড়।

কমাণ্ডার দেখলেন মহা বিপদ। দলের লোকেরা এভাবে পালাতে শুরু করলে যুদ্ধ করবেন কাকে নিয়ে? তিনি তাদের ফেরাবার চেষ্টা করলেন। বললেন, "ভাইজান, তোমরা পিছু হটছো কেন? মনে হিম্মৎ রাখো, হিন্দুস্থানী কাফেরগুলি এখুণি ঘায়েল হবে। একটু পরেই শ্রীনগর আমাদের কব্জায়। জিহাদ হাসিল কর—"

কে শোনে কার কথা! হানাদারেরা বলে, "আরে রাখো মিঞা, তোমার শ্রীনগর। আপনি বাঁচলে বাপের নাম। জান যায়, তায় জিহাদ!" তাড়াতাড়ি পালাতে লাগলো তারা যার যে দিকে দু'চোখ যায়।

কিন্তু যেদিকে সেদিকে যাওয়ার কি জো আছে? ভারতীয় সৈন্যেরা আছে যে তিন দিকেই। খোলা একমাত্র পিছনের পথ। যে পথে হানাদারেরা হানা দিয়েছিল শ্রীনগরের পানে। উল্টে সে পথেই ঊর্ধ্বশ্বাসে পিছু হটলো তারা। পিছনে মরে পড়ে রইল তাদের শ'তিনেক সঙ্গী। কিছু রেখে গেল লুটের মাল, কিছু ফেলে গেল যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম।

প্রাণের মায়ায় ছোটা,—বড় বিষম ছোটা। পড়ি তো-

ঝিলম নদীর তীর

মরি করে ছুটতে ছুটতে হানাদারেরা সেলাটং থেকে পালালো পাটানে। পাটান থেকে বারমূলায়।

উল্লাসে ভারতীয় বাহিনী পিছনে ধাওয়া করল তাদের। কিন্তু শহরে যাত্রীচলার মোটর বাসগুলি কত আর জোরে চলতে পারে? তবুও সৈন্যদলের ড্রাইভারেরা চেষ্টা করল প্রাণপণ। গাড়ির এক্সিলারেটরটা ডান পায়ে চেপে ধরল পুরোপুরি। স্পিডোমিটারের কাঁটাটা, চল্লিশ থেকে লাফিয়ে উঠল পঞ্চাশে। পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন। সৈন্য বোঝাই বাসের জানালা খড়খড়িগুলি কাঁপতে লাগল সশব্দে। স্টিয়ারিংটা ধরতে হলো শক্ত মুঠোয়।

"চালাও, চালাও জোরসে।" হাঁকতে লাগলো ভারতীয় সৈন্যদলের সেনানায়ক। ঐ যে দেখা যাচ্ছে,— পালাচ্ছে দুশমনেরা। আর একটু এগোলেই ধরে ফেলা যাবে তাদের। "জোরে, আরও জোরে চালাও ড্রাইভার, আউর জোরসে।" পঞ্চান্ন, সাতান্ন—স্পিডোমিটারের কাঁটা উঠছে। ষাট, বাষট্টি—আর একটু, আরও—!

ঘট্ ঘট্ ঘট্‌ট—ঘটাং।

বেগ কমে ধীরে ধীরে গাড়ি ঠায় থেমে গেল। কী ব্যাপার? মোটরের ইঞ্জিন বিগড়েছে বুঝি? ড্রাইভার হ্যাণ্ডল ঘুরিয়ে স্টার্ট দিতে চেষ্টা করল। টানল চোক। বনেট খুলে পরীক্ষা করলো যন্ত্রপাতি। না। পেট্রোল ফুরিয়েছে গাড়ির। এক ফোঁটা তেল নেই পেট্রোল ট্যাঙ্কে।

সাত

বারমূলা থেকে হানাদারেরা পালিয়ে গেল দূরে।

গাছ না উপড়ে বড় থামে না ঝড়, গাঁ না মজিয়ে নড়ে না মড়ক। লুটতরাজ খুন-খারাপি না করে দস্যুদলই বা বিদায় হয়েছে কবে কোন্ দেশে? হানাদারেরা গেল। কিন্তু যাবার আগে তাদের হাতের ছাপ রেখে গেল বারমূলার আষ্টেপৃষ্ঠে। হাতের ছাপ তো নয়, নখের দাগ। সে দাগ বহু শোকের অশ্রু দিয়ে ভেজা, বহু লোকের রক্ত দিয়ে লাল।

হানাদারেরা বারমূলায় চড়াও হয়েছিল দিনে-দুপুরে। পুরুষেরা তখন যে যার কাজে বাইরে। হাটে চলেছে বেচা-কেনা, মাঠে চলেছে নিড়েন। কাছারিতে চোখে চশমা এঁটে মুন্সীরা লিখছে উর্দু বয়ানে দশধারার আরজি। মাদ্রাসার বুড়ো মৌলভী সাহেব শাদা দাড়িতে হাত বুলিয়ে কিশোর ছাত্রদের শেখাচ্ছেন—আলীফ্, বে, তে, সে।

শহর দখল করে দস্যুরা দলে-বেদলে ছড়িয়ে পড়ল নানা দিকে। যেন পাকা ফসলের ক্ষেতে আচমকা নেমে এল রাশি রাশি পঙ্গপাল। সব ধ্বংস করে দিলো দু'দণ্ডে।

ঝিলম নদীর তীর

প্রথম পর্যায় লুঠ। বাক্স ভেঙে নিল টাকাকড়ি। সিন্দুক ভেঙে সোনাদানা। মেয়েদের গা থেকে ছিনিয়ে নিল গহনা। তাঁতি বউ হারালো গলার হাঁস্থলি, নাপিত বউ-এর গেল হাতের বাজুবন্ধ্। অতি দরিদ্রের ঘরে আর কিছু না পেয়ে দস্যুরা হেঁশেল থেকে টেনে নিয়ে গেল পিতল কাঁসার বাসনপত্র। সন্ধ্যাবেলা ধানের গোলায় আর তিসির আড়তে আগুন ধরিয়ে দিয়ে করল উল্লাস। রঙ্গ করে একে অন্যকে বলল,—বড়ি আচ্ছি রোশনাই হো রহী হৈ,—বাঃ, খুব উজ্জ্বল আলো হচ্ছে তো!

লুণ্ঠন আর হনন। যমজ ভাই-এর মতো চলে পিঠোপিঠি। হিন্দু আর শিখ সামনে পেলে আর রক্ষে নেই। হানাদারেরা নিমেষে তাদের হত্যা করতে লাগলো পৈশাচিক উল্লাসে। যুবক, বৃদ্ধ, নারী, পুরুষ,—কোনো বাছ-বিচার রইল না আর কোনোখানে। স্ত্রীর চোখের সামনে কত স্বামীর মাথা পড়ল কাটা। মায়ের কোলে কত শিশুর বুকে বিঁধলো গুলী। ঝোপে জঙ্গলে লুকিয়ে যারা কোনো মতে প্রাণ বাঁচালো তাদেরও সবার দেহ অক্ষত রইল না।

কাশ্মীর আক্রমণকে পাকিস্তান বরাবর বলেছে—ধর্মযুদ্ধ। কাশ্মীরের প্রজারা বেশীর ভাগ মুসলমান। মহারাজা হিন্দু। তিনি নাকি কেবলই মুসলীম নির্যাতন করেন। তাই উপজাতীয় মুসলমানেরা ক্ষেপে গিয়ে কাশ্মীরে চড়াও হয়েছে, তাদের স্বধর্মীদের ত্রাণ করতে।

ঝিলম নদীর তীর

এ তো যেমন তেমন লড়াই নয়,—এ জিহাদ। ওরা তো হানাদার নয়,—ওরা মুজাহিদ! বলছেন পাকিস্তানের কর্তারা।

মুজাহিদেরা কিন্তু মুসলমানকেও রেহাই দিলো না বারমূলায়। ত্রাণ করণের বদলে প্রাণ হরণ হলো সেখানে। মুসলমান যাদের ধন বা প্রাণ গেল তাদের মধ্যে নাম না-জানা ছিল অনেকে। নামজাদা ছিলেন অবশ্য মকবুল শেরোয়ানী।

শেরোয়ানী বারমূলার গণ্যমান্য নেতা। তাঁর কথা সবার মুখে মুখে, তাঁর খ্যাতি রটেছে পথে-ঘাটে। লোকের রোগে-শোকে তিনি ভাই-এর মতো দরদী, বিপদে-আপদে তিনি সখার মতো সহায়। সারা শহরে তাঁর সুনাম ধরে না।

কিন্তু তাঁর উপরে পাকিস্তানীদের রাগ ছিল অনেক দিনের এবং অনেকখানি। পাকিস্তানের যিনি শাহানশা বাদশা, সেই কায়েদে আজম জিন্নাকে একবার বড়ই অপদস্থ করেছিলেন মকবুল শেরোয়ানী।

কয়েক বছর আগে জনাব জিন্না এসেছিলেন কাশ্মীরে। বারমূলার এক সভায় বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। বললেন, "কাশ্মীরী মুসলমানেরা সব এক হোক, তাদের এক আল্লা, এক কলেমা, এক দল।"

শেরোয়ানী ছিলেন সে সভায় একজন শ্রোতা। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "ঠিক কথা। এক হোক, তবে শুধু

মুসলমান নয়,—এক হোক হিন্দু, মুসলমান, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পারশি, খৃস্টান।—এক হোক কাশ্মীরের সমস্ত জনগণ।"

জিন্না রেগে বললেন, "হিন্দুরা কাফের, মুসলমানের শত্রু।"

মকবুল শেরোয়ানী উত্তর দিলেন, "হিন্দুরা মানুষ, মুসলমানের ভাই।"

রাগে জিন্না সাহেবের চক্ষু রক্তবর্ণ। মুখে যোগালো না কথা। বার্নিশ করা জুতো মশ্ মশ্ করে ক্রুদ্ধ পদক্ষেপে সভা ছেড়ে চলে গেলেন সেই মুহূর্তে। ফুলের মালা রইল পড়ে। জয়ধ্বনি রইল বাকী।

সেই পুরানো কাহিনী মনে ছিল পাকিস্তানীদের। তার শোধ তুললো এতদিনে। হানাদারেরা শেরোয়ানীকে বেঁধে নিয়ে গিয়ে হাজির করলো তাদের সর্দারের সামনে। বললো, "সেলাম করো।"

শেরোয়ানী নির্ভীক। হেসে বললেন, "গুরুজনের চরণ ছাড়া করিনে কারে প্রণিপাত।"

স্পর্ধা বটে। রোষে ফুলতে থাকে সর্দারের অনুচরেরা।

মনের ক্রোধ চেপে রেখে সর্দার বললেন, "আমরা কাশ্মীর জয় করেছি। শ্রীনগর দখল করবো দু'-এক দিনে। আমাদের দলে যোগ দাও। সাহায্য কর।"

শেরোয়ানী জবাব দিলেন, "আক্রমণকারীকে বাধা

দেওয়া কাশ্মীরের প্রত্যেকটি মানুষের কর্তব্য। তোমরা দস্যু। তোমরা নিপাত যাও!"

শুনে সবাই গর্জে ওঠে। কেউ হাঁকে গর্দান লাও, কেউ চড়াতে চায় শূলে। আর কেউ বা চোখ লাল করে বলে, হেঁটোয় কণ্টক দাও, উপরে কণ্টক; ডালকুত্তাদের মাঝে করহ বণ্টক।

সর্দার হুকুম দিলেন, "হাটের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে প্রথমে গুণে গুণে লাগাও দু' শ' কোড়া। পিঠে পাঁচ শ' পয়জার। কমবক্তের তাতেও শিক্ষা না হলে গুলী করে মাথার খুলি উড়িয়ে দাও সবার সামনে।"

তখন শেরোয়ানীর হাতে উঠলো হাতকড়ি, পায়ে পড়লো বেড়ি। কোমরে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে জল্লাদেরা নিয়ে গেল চৌরাস্তার মোড়ে। বধ্যভূমিতে। সেখানে হানাদারেরা এসে ভিড় জমালো মজা দেখার আশায়।

শেরোয়ানী অবিচলিত। শপাং শপাং শব্দে পিঠে পড়তে লাগলো চাবুক। একের পর এক। কতগুলি লাগলো বুকে, মুখে, চোখে। কেটে গিয়ে, রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগলো সর্বাঙ্গে।

সর্দারের লোকেরা ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললে, "এখনও বাঁচার সময় আছে, আমাদের দলে যোগ দিতে রাজী থাকো তো বলো, বলো—পাকিস্তান জিন্দাবাদ!"

মকবুল শেরোয়ানীর চেঁচিয়ে কথা বলার শক্তি নেই,

ঝিলম নদীর তীর

চেতনা পাচ্ছে লোপ, জিব আসছে জড়িয়ে। তবুও কোনো মতে অতি ক্ষীণকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, "কাশ্মীর জিন্দাবাদ, মেরী পিয়ারী কাশ্মীর—কাশ্মীর বেঁচে থাক, আমার সাধের কাশ্মীর—।"

পর মুহূর্তে তিন দিক থেকে তিনটে বন্দুক এক সঙ্গে গর্জে উঠল তাঁর মাথা তাক করে।

হানাদারেরা উল্লাসে হর্ষধ্বনি করে বলল—অবাধ্যের এই সমুচিত শাস্তি। অন্য লোকেরা দেখে শিখুক।

দেখে শেখার লোক আর বড় বাকী ছিল না। হানাদারেরা মেরে কেটে প্রায় সাবাড় করে এনেছিল সব।

কিন্তু ঠেকে শিখতে হলো আরও কয়েকজনকে। তারা কাশ্মীরী নয়, বিদেশী।

খৃস্টান মিশনারীদের এক আশ্রম ছিল বারমূলায়। "প্রেজেণ্টেশান কনভেণ্ট" তার নাম।

অনেক কাল আগের কথা। এক ইংরেজ মহিলা এসেছিলেন কাশ্মীরে। রোমান ক্যাথলিক সিস্টার। চিরকুমারী, সন্ন্যাসিনী। কাশ্মীরে চাষী মজুরদের দুঃখ-দুর্দশা দেখে তাঁর হৃদয় কাতর হলো করুণায়। স্থির করলেন, সেইখানে দরিদ্রের সেবায় জীবন কাটিয়ে দেবেন তিনি। স্বদেশ, সমাজ ও স্বজন পড়ে রইল পিছনে। নিজের ইচ্ছায় মাথায় তুলে নিলেন সহস্র যোজন দূরে এক অপরিচিত দেশের দুঃস্থ জনগণের দুঃখ মোচনের ভার। নিজের অতি সামান্য সম্বল নিয়ে স্থাপন করলেন

এক আশ্রম। এই প্রেজেণ্টেশান কনভেণ্ট। তার আয়তন ক্ষুদ্র, আয়োজন সামান্য। কিন্তু আন্তরিকতা কম নয়।

তারপরে বহু বছর গিয়েছে কেটে। বহু ধর্মপ্রাণ দানশীল বিদেশীর দানে ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠেছে সেই কনভেণ্ট। ক্ষুদ্র অঙ্কুর থেকে দিনে দিনে যেমন গড়ে ওঠে বিরাট মহীরুহ। শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত, পুষ্প-পল্লবে সমৃদ্ধ। আজ প্রেজেণ্টেশান কনভেণ্টে আছে হাসপাতাল। সেখানে প্রত্যহ শত শত অসুস্থেরা পায় ওষুধ। আছে বিদ্যালয়। সেখানে দরিদ্র ছেলেমেয়েরা নেয় পাঠ। আছে নারী শিল্পাগার। সেখানে অনাথা স্ত্রীলোকেরা শেখে তাঁত চালনা, উল বোনা, সেলাই ও অন্যান্য কারু কাজ।

সেদিনের সেই পুণ্যশীলা প্রতিষ্ঠাত্রী গিয়েছেন পরলোকে। তিনি নেই। কিন্তু আছে তাঁর কাজ, রয়েছে তাঁর আদর্শ। সে কাজ হাতে নিয়েছেন, সে আদর্শ সফল করেছেন নানা দেশ থেকে আগত নবীন সন্ন্যাসিনীরা। নতুন একদল সিস্টার। কেউ ফরাসী, কেউ জার্মান, কেউ বা ইটালীয়ান। তাঁদের জাতি আলাদা, ভাষা পৃথক, কিন্তু লক্ষ্য এক। সে লক্ষ্য পরোপকার।

হানাদারেরা বারমূলায় আসছে শুনে কনভেণ্টের অনেকেই ভীত হলো। মাদার সুপিরিয়র কনভেণ্টের প্রধান কর্ত্রী। তিনি আশ্বাস দিয়ে বললেন, "আসে আসুক। আমরা রোগীর শুশ্রূষা করি, আর্তের সেবা

করি। দীন দরিদ্র নিয়ে আমাদের কাজ। কারো সঙ্গে কোনো বিরোধ নেই আমাদের। আমাদের ভয় কিসের?"

হায়! তিনি জানতেন না যে, যারা লুঠ করে তাদের রীতি আলাদা। সাধুর তারা শত্রু, ভালোর তারা যম। তাদের বিরোধ জগতের সমস্ত সভ্য ও শিক্ষিত নরনারীর সঙ্গে।

মাদার সুপিরিয়রের ভুল ভাঙতে বিলম্ব হলো না।

বেলা তখন পাঁচটা। পীর পঞ্জলের মাথায় শাদা বরফের গায়ে লেগেছে পড়ন্ত রোদের আধ-গোলাপী রঙ। বাগানে সবুজ ঘাসের উপর পপলার গাছগুলির ছায়া পড়েছে দীর্ঘ। আলখাল্লার মতো লম্বা ময়লা পিরান গায়ে, চাপা টুপি মাথায় ক্লান্ত গুজরালেরা মেষের পাল নিয়ে কাঁচা মকাই চিবোতে চিবোতে ফিরছে ঘরে।

কনভেণ্টের স্কুলে ছুটির ঘণ্টা বেজেছে অনেকক্ষণ। ছাত্র-ছাত্রীরা চলে গিয়েছে যে যার বাড়িতে। হাসপাতালে রোগীরা শুয়ে আছে বিছানায়। এমন সময় হঠাৎ শোনা গেল কোলাহল। হৈ-হুল্লোড়ে একদল হানা দিলো কনভেণ্টে।

কনভেণ্টের অথিতিশালায় ছিলেন কয়েকজন বিদেশী। কেউ নতুন এসেছেন বেড়াতে, কেউ বা আছেন অনেক দিন। তাদের মধ্যে ছিলেন এক বৃদ্ধ ইংরেজ। লেফটেনেণ্ট কর্নেল ভি. ও. টি. ডাইকস। আগে কাজ

করতেন ভারতীয় সেনা বিভাগে, পেন্সনের পর রয়ে গিয়েছেন এদেশে। সস্ত্রীক বসবাস করছেন এই কনভেণ্টে। বাতে প্রায় পঙ্গু। তবুও সাধ্যমত হিসাবপত্র লেখার কাজকর্ম করে সিস্টারদের সাহায্য করেন মাঝে মাঝে। বিপদের সময় এই বৃদ্ধই বন্দুক হাতে এগিয়ে গেলেন সামনে। রুখতে চাইলেন দস্যুদের কনভেণ্টের বাইরে।

কিন্তু বার্ধক্যে ডাইকসের শরীর বলহীন। চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ। বাতে আড়ষ্ট হাতে বন্দুক তুলে তাক করার আগেই হানাদারদের গুলীতে প্রাণ হারালেন তিনি।

ভয়ে ও উদ্বেগে স্বামীর সঙ্গে ঠিক তাঁর পিছনেই ছিলেন স্ত্রী মিসেস ডাইকস। একটি ভীরু খরগোশের ছানার উপরে এক পাল হিংস্র জন্তুর মতো তাঁর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল হানাদারদের দল। শুধু একবার বুঝি একটি আর্তনাদ শোনা গেল। পর মুহূর্তেই আক্রমণকারীদের উদ্দাম আস্ফালন ও উন্মত্ত কোলাহলে চাপা পড়ে গেল সে কাতর স্বর! দু'দিন পরে মিসেস ডাইকসের নগ্ন মৃতদেহটা খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল একটা গভীর কূপের মধ্যে। মৃত মহিলার গায়ের জামা কাপড়টুকু পর্যন্ত নিতে বাকী রাখেনি তাঁর হত্যাকারীরা।

কনভেণ্ট থেকে প্রচুর ধনদৌলত বস্তা বোঝাই করে নিয়ে যাবে—এই আশা ছিল দস্যুদের। নিরাশ হলো।

আশ্রম শোভার জন্য নয়,—সেবার জন্যে। সেখানে না থাকে মণি-মুক্তার ছড়াছড়ি, না আছে হীরা-জহরতের জাঁকজমক। অগত্যা দেয়ালের ঘড়ি, আলনার জামা কাপড় আর জানালার পর্দা নিয়েই হানাদারেরা কাড়াকাড়ি করতে লাগল।

লুঠের মাল যতই হলো কম, লুণ্ঠনকারীদের ততই বাড়ল রোষ। জিনিষপত্র ভেঙে গায়ের ঝাল ঝাড়তে লাগল। ঘরের টেবিল, চেয়ার, আলমারি, দেরাজ, পেয়ালা, পিরিচ, শার্শি, কপাট করলো চৌচির। তাদের অস্ত্রের আঘাতে বাগানের পাশে সমাধিস্থানে শ্বেত পাথরের ক্রশ চিহ্নগুলি পর্যন্ত হলো চূর্ণবিচূর্ণ।

এতেও শান্ত হলো না ক্রোধ। বরং খুন চেপে গেল মাথায়। কনভেণ্টের বিদেশী সন্ন্যাসিনী মেয়েদের ন' জনকে সঙ্গীনের পাহারায় এনে এক সারিতে দাঁড় করালে উঠনে। ন' জন হানাদার বন্দুক উঁচিয়ে তাক করল তাদের কপালে। শুধু গুলী ছোঁড়ার অপেক্ষা। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে দুরু দুরু বুকে চোখ বুজে ভগবানের নাম স্মরণ করলেন সন্ন্যাসিনীরা।

কিন্তু রাখে খ্রীস্ট মারে কে ? আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে ন'টি পরোপকারী সন্ন্যাসিনীদের রক্ষা করল অদৃশ্য থেকে নিশ্চয়ই ভগবান, কিন্তু প্রকাশ্যে একটি অতি ক্ষুদ্র জিনিষ।

সন্ন্যাসিনীদের মধ্যে একজনের সমুখের একটি দাঁত ছিল সোনা-বাঁধানো। সেটা চোখে পড়তেই এক জহ্লাদ

বন্দুক ফেলে দিয়ে ছুটলো সেটা দখল করার লোভে। কিন্তু লুঠের নজর তো একা তারই তীক্ষ্ণ নয়, তার অন্য সাঙাতরাও কিছু চোখ বুজে ছিল না। কাজেই সোনার লোভে নিজেদের মধ্যেই বাধলো কলহ। প্রথমে গালাগালি ; শেষে হাতাহাতি। হট্টগোলের মধ্যে হানাদারদের এক কর্তা এসে হাজির। তাঁর কাণ্ডজ্ঞান আছে। কাশ্মীরী মেয়ে পুরুষ হত্যা করা এক, য়ুরোপীয় সন্ন্যাসিনীদের গুলী করা আর—সেটুকু তিনি বোঝেন। তাই শেষ মুহূর্তে অভাবনীয় রূপে প্রাণ রক্ষা হলো তাঁদের।

হানাদারদের আর এক দল ততক্ষণ ব্যস্ত ছিল কনভেণ্টের অন্য এক অংশে। তারা চড়াও হলো হাসপাতালে। যা' সামনে পেল তাই করল খান্‌খান্‌। যাকে হাতে পেল তাকেই করল আহত বা নিহত। বন্দুকের বাঁটের ঘায়ে টুকরো টুকরো করল দামী এক্স-রে যন্ত্রপাতি। শিশি বোতল দিলো গুঁড়িয়ে, ওষুধপত্র গেল গড়িয়ে, ক্ষত-বিক্ষত হলো অসহায় অসুস্থ নরনারী। মারা গেল একজন নার্স, আয়ু শেষ হলো দুজন রোগীর।

প্রাণ দিলেন আরো একটি পুণ্যবতী মহিলা। সিস্টার টেরেসেলীন। কনভেণ্টের সহকারী মাদার সুপিরিয়র। সুদূর য়ুরোপের স্পেন দেশ থেকে এসেছিলেন বারমূলায় পরহিতের ব্রত নিয়ে। কনভেণ্টের উপাসনা স্থানটি পাছে হানাদারদের আক্রমণে অপবিত্র হয়, এই আশঙ্কায়

ঝিলম নদীর তীর

প্রহরীর মতো তিনি একা দাঁড়িয়েছিলেন মন্দিরের দুয়ারে। গুলী এসে বিঁধলো তাঁর বুকে।

সেদিন বারমূলায় দস্যুদের আঘাতে ছিন্ন হলো একটি কোমল লতার মূল। সেদিন জনসেবার বেদীতে নিবলো একটি স্নিগ্ধ দীপের শিখা।

সেদিন শুভ্র পাষাণ ফলকে পড়িল রক্ত লিখা '

আট

শ্রীনগর থেকে পেট্রোল যোগাড় করে অবশেষে বারমূলায় এসে পৌঁছলো ভারতীয় সৈন্যদল। সূর্য তখন অস্ত গিয়েছে। ধীরে ধীরে সন্ধ্যার অন্ধকার নামছে ঘনিয়ে।

নিঝুম নিস্তব্ধ নগর। অনেক ঘা খেয়ে অসহ্য ব্যথায় অজ্ঞান হয়ে যাওয়া মানুষের মতো যেন পড়ে আছে ক্ষতবিক্ষত বারমূলা। অসাড় অচৈতন্য। তার পথগুলি জনহীন, ঘর-দোর শূন্য। রাস্তার ধারে, বাড়ির উঠনে ছড়িয়ে আছে মৃতদেহ। সেখানে শকুনি গৃধিনীদের চলছে ফলার, শেয়াল কুকুরে বেধেছে মারামারি। হায়, বারমূলা ছিল শহর,—বারমূলা হয়েছে শ্মশান!

পরদিন সকালেই ব্রিগেডিয়র সেনের সৈন্যদল আবার বেরিয়ে পড়ল হানাদারদের সন্ধানে। কিন্তু তাদের কি আর নাগাল পাওয়া যায়? তারা ততক্ষণে সরে পড়েছে অনেক দূরে। পালাবার সময় রাস্তাঘাট নষ্ট করে রেখে গিয়েছে যাতে ভারতীয় সৈন্যদল সহজে পিছু ধাওয়া করতে না পারে। পথের মাঝখানে ফেলে রেখে গিয়েছে বিরাট গাছের গুঁড়ি। কোথাও বা পাশের পাহাড় থেকে গড়িয়ে দিয়েছে মস্ত মস্ত পাথরের চাঁই। সে সব না সরিয়ে

এগোতে পারে না জীপ বা মোটর বাস। তার উপরে আবার পেট্রোল ফুরিয়ে যায় মাঝে মাঝে। শ্রীনগর থেকে নতুন পেট্রোল এসে না পৌঁছানো পর্যন্ত বসে থাকতে হয় নিরুপায়।

এমনি করে ভারতীয় সৈন্যরা এসে পৌঁছল রামপুর। যে-পথে লাগে কয়েক ঘণ্টা, সে-পথে লাগলো কয়েক দিন।

শ্রীনগরে যারা আছে তারা আশা ও আশঙ্কায় দুলছে অহরহ। কী হয়, কী হয়। সেলাটং ছিল ঘরের কোণায়। কানের কাছে গোলাগুলীর আওয়াজ শোনা গিয়েছে। লোকের মুখে খবর পাওয়া গিয়েছে। এখন শত্রুকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে দূরে। সেখানকার হার-জিতের সঠিক সংবাদ জানে না কেউ। থেকে থেকে গুজব রটেছে নানা রকম। তার কোনটা সত্যি, কোনটা মিথ্যে হদিশ পাওয়া ভার। সকালে শোনা গেল, ভারতীয় সৈন্য হানাদারদের ঘায়েল করেছে। শুনে লোক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। পরক্ষণেই শোনা যায় তার উল্টো। ভারতীয় সৈন্যদের নির্মূল করে হানাদারেরা নাকি আবার এগিয়ে আসছে শ্রীনগরের পথে। তখন ভয়ে সবার মুখ শুকিয়ে যায়। বুক করে দুরু দুরু। বাক্স-বিছানা বেঁধে পালাবার উদ্যোগ করবে কিনা ভাবে। এমনি করে দিন কেটে যায়।

হঠাৎ এক সন্ধ্যেবেলা শ্রীনগরের বিজলী আলোগুলি ঝলমলিয়ে উঠলো।

ঝিলম নদীর তীর

ছেলে, বুড়ো, মেয়ে, পুরুষ সবাই ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে খানিকক্ষণ। প্রথমে লাগে অবাক, পর মুহূর্তেই জাগে আনন্দ। য়্যা মহুরা? তাহলে মহুরায় পেঁাছে গিয়েছে ভারতীয় সৈন্যদল? হানাদারদের দিয়েছে হটিয়ে? খুশিতে এ ওকে জড়িয়ে ধরে বলে, "মহুরা, মহুরা এসেছে আমাদের দখলে।"

হ্যাঁ; রামপুর থেকে মহুরায় এসে পেঁাচেছে ব্রিগেডিয়র সেনের সৈন্যদল। আজকাল সেনাবাহিনীর সঙ্গে থাকে জন কয়েক এঞ্জিনীয়র। তাঁরা যুদ্ধ করেন না, কিন্তু যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম নিখুঁত রাখেন। জোড়াতালি দিয়ে অচল কলকব্জা সচল করতে তাঁরা ওস্তাদ। জীপ, লরী, মোটর, ট্যাঙ্ক মেরামতিতে তাঁদের জুড়ি নেই। জলবিদ্যুতের যন্ত্রপাতি তাঁদের কাছে নতুন হলেও একেবারে অসাধ্য নয়। দিন কয়েকের চেষ্টায় ভাঙা টুকরোগুলো জুড়ে তাঁরা বিদ্যুৎ কারখানার ডাইনামোটা চালু করে দিলেন। আলো জ্বলে উঠলো রাজধানীতে। শুধু পথে বা ঘরে নয়, লোকের মনেও।

নয়

মহুরা থেকে উরির পথের দু'ধারে উঁচু পাহাড় আর ঘন বন। সেখানে লুকিয়ে থেকে শত্রু আচমকা আক্রমণ করতে পারে যে কোন মুহূর্তে। তাই ভারতীয় সৈন্যদলকে এবার এগোতে হয় সাবধানে। খবরদারীর জন্য সহায়তা নিতে হয় বিমান বাহিনীর।

শ্রীনগরের বিমানঘাঁটিটি ক্ষুদ্র। মহারাজা তৈরী করেছিলেন তাঁর নিজের বিমান চলাচলের জন্যে। সে-বিমান সৌখীন প্রমোদ-ভ্রমণের বাহন। আকারে ছোট, ওজনে কম। তাই বিমানঘাঁটির রানওয়ে যেমন সরু, ফ্লাইং কণ্ট্রোল, বাতাসের গতি ও আবহাওয়ার হালচাল জেনে নেওয়ার যন্ত্রপাতিও তেমনি সাধারণ। বড় বিমান চলাচলের ব্যবস্থা ছিল না সেখানে। ভারতীয় বিমান বাহিনীর বড় কর্তারা তখন প্রায় সবাই ইংরেজ। তাঁরা দিল্লী থেকে এসে বিমানঘাঁটি পরিদর্শন করলেন। বিশেষজ্ঞ যত ছোট, মেজ, সেজ ও বড় সাহেব তাঁরা দিন দুই ধরে তার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, পরিধি প্রভৃতি পরীক্ষা করলেন। ফিতা ফেলে মাপলেন, খড়ি দিয়ে দাগলেন, খাতা-পেন্সিল নিয়ে করলেন ভগ্নাংশ, দশমিক ও বর্গফলের রাশি রাশি অঙ্ক। তারপরে এক

ঝিলম নদীর তীর

দিস্তা কাগজে নোট লিখে বললেন,—অসম্ভব। শ্রীনগর বিমানঘাঁটিতে জঙ্গী বিমানের ওঠা-নামা চলে না।

বিশেষজ্ঞদের মত, সে তো না মেনে উপায় নেই। অগত্যা পালম থেকেই বিমান বাহিনীর বিমানগুলিকে উড়ে আসতে হয় কাশ্মীরে। তাতে অসুবিধা অনেক। বিমানে পেট্রোল নেওয়ার জায়গা অল্প। যেতে আসতেই বেশীর ভাগ পেট্রোল ফুরিয়ে যায়।

দিন কয়েক পরেই কিন্তু সমস্যার সুহারা হয়ে গেল এক আশ্চর্যজনক ঘটনায়।

পাহাড় পর্বতের আড়ালে, ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে যুদ্ধের এলাকাটা আকাশ থেকে চিনতে যাতে অযথা বিলম্ব না ঘটে সে জন্যে একটা বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। দিল্লীর সদর দপ্তর থেকে খবর পেলেই কাশ্মীরে ভারতীয় সৈন্যদল খড়কুটো জড়ো করে আগুন জ্বেলে রাখতো তাদের ছাউনির কিনারে। বিমানগুলি সেই আগুন দেখে সহজেই তাদের লক্ষ্যস্থল বুঝতে পারতো। সেদিন সকাল বেলা পালম থেকে ছু'খানা স্পিটফায়ার বিমান নিয়ে রওনা হলো বিমান বাহিনীর ছুজন তরুণ পাইলট। উড়ে এল পাটানে। নীচে তাকিয়ে দেখলো, কোথাও কোনখানে আগুনের চিহ্ন নেই। বেতারে খবর পাঠাতে ভুল করেছে বেতারবার্তার অপারেটার। তাই ব্রিগেডিয়র সেনের দপ্তর আগে ভাগে জানতে পায়নি বিমানগুলির দিল্লী থেকে রওনা হওয়ার সংবাদ।

তাই তো, এখন কী করা যায়? ফিরে যেতে হবে দিল্লীতে? তাছাড়া আর উপায় কী? পাইলটেরা ভাবে, মিছিমিছি এতখানি পেট্রোল নষ্ট হবে, কোনো কাজ না করে ফিরে যাবো, সে কেমন কথা। তার চাইতে—। মিনিট দুই ভেবে নিয়ে এক পাইলট বেতার টেলিফোনে অন্য পাইলটকে জিজ্ঞাসা করে, "শ্রীনগর বিমানঘাঁটিতে নেমে একবার খোঁজ নিলে হয় না?"

দ্বিতীয় জন জবাবে বলে, "তা' হয়, কিন্তু বড় সাহেবরা যে বলেন,—স্পিটফায়ার নামতে পারে না সেখানে।"

"সাহেবরা যাই বলুন আমি কিন্তু আমার বিমান নিয়ে ঠিক নামতে পারি ঐ রানওয়ের উপরে।" বলল প্রথম পাইলট।

দ্বিতীয় জন বলে, "আমিও।"

"তবে এস, জয় হিন্দ বলে নামা যাক শ্রীনগরে।"

যেই কথা সেই কাজ। রেডী? ওয়ান, টু, থ্রি, ডাউন! হুশ, হু-উ-শ্।

একের পর এক, দুটি স্পিটফায়ার বিমানঘাঁটির কর্তৃপক্ষ ও ফ্লাইং কন্ট্রোলের কর্মচারীদের অবাক করে দিয়ে নির্বিঘ্নে নেমে পড়ল শ্রীনগরের ছোট রানওয়ের উপর। ভুলের ফলেই ফলল সুফল। বিমানঘাঁটি থেকে পাইলটেরা ম্যাপের উপর লাল পেন্সিলে দাগ দিয়ে নিলো লড়াই-এর সীমানা। আবার উঠলো আকাশে।

ঝিলম নদীর তীর

শত্রুপক্ষের মাথার উপরে গুলী বৃষ্টি করে সন্ধ্যার আগেই ফিরে গেল দিল্লীতে।

বিমান-শাস্ত্রের বিধানে যা' ছিল এতকাল অসম্ভব, তাই সম্ভব করলো অসম সাহসিক দুটি ভারতীয় তরুণ। তাদের গর্বে ভরে উঠলো তাদের সহকর্মীদের বুক। তাদের বীরত্বে উজ্জ্বল হলো সমস্ত ভারতবাসীর মুখ।

পরদিন শ্রীনগর বিমানঘাটিতে নতুন দপ্তর খোলা হলো ভারতীয় বিমান বাহিনীর। দিল্লী থেকে এসে পেঁছল অনেকগুলি স্পিটফায়ার। সেই সঙ্গে এল, ক্রু, ফিটার, মেকানিক, গ্রাউণ্ড এঞ্জিনীয়র, পাইলট অফিসার ইত্যাদি বিমান বহরের কর্মচারী দল। তাদের মালপত্র, যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম। অধিনায়ক হয়ে এলেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন মেহের সিং, ডি. এস. ও.।

বিমান বাহিনীর সহায়তায় ব্রিগেডিয়র সেনের সেনাদল মহুরা থেকে রওনা হলো হানাদারদের সন্ধানে। আশপাশের ঝোপ-জঙ্গলে ছোটখাটো শত্রুদল যা' লুকিয়ে ছিল, তারা সাবাড় হয়ে গেল ভারতীয় সৈন্যদের বন্দুকের গুলীতে। কিন্তু আসল বড় দলটা তখনও অনেক দূরে। তাকে ধরতে হলে জোরে পিছু ধাওয়া করতে হবে।

কিছু দূর এগোতেই দেখা গেল সামনে গভীর ও চওড়া বিরাট এক নালা। তাতে পাহাড়ের ঝরনা থেকে স্রোত বয়ে যাচ্ছে তীর বেগে। গাড়ি পার হওয়ার উপায় নেই।

ঝিলম নদীর তীর

পাথরে বাঁধানো শক্ত পুলটিকে হানাদারেরা বারুদ জ্বালিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে অনেক আগেই।

ডাক পড়ল এঞ্জিনীয়রদের। তাঁরা বললেন, নতুন করে সেতু গড়তে চাই ভারী ভারী মাল-মশলা তা' এখন দুর্ঘট। আর চাই যথেষ্ট সময়। তার এখন অভাব।

কোনো কিছুতেই হাল ছাড়ার পাত্র নন ব্রিগেডিয়র সেন। বললেন, গাড়ি, জীপ, ট্রাক, লরী থাক পড়ে এখানে। শত্রুর পিছু ধাওয়া করতে হবে পায়ে হেঁটে। দখল করতে হবে উরি যেমন করেই হোক।

সৈন্যেরা সেলাম করে বলল, "জো হুকুম।"

পায়ে হেঁটেই তারা তাড়া করল হানাদারদের। বীর দর্পে দখল করল উরি। চৌদ্দই নভেম্বর তিন সপ্তাহ আগে হানাদারদের রুখতে গিয়ে যেখানে প্রাণ দিয়েছিলেন ব্রিগেডিয়র রাজেন্দ্র সিং, ঠিক সেখানেই উঁচু এক মঞ্চের উপর ব্রিগেডিয়র এল. পি. সেন সর্বপ্রথম উত্তোলন করলেন অশোক চক্র আঁকা গেরুয়া, সাদা ও সবুজ রঙের নিশান। স্বাধীন ভারতের ত্রিবর্ণ জাতীয় পতাকা।

সবার কণ্ঠে উঠল উচ্চ রব, "জয় হিন্দ"। স্বাধীন ভারতের জয়ধ্বনি।

সৈন্যদলের ব্যাণ্ডে বাজতে লাগল, "জন গণ মন অধিনায়ক—"। স্বাধীন ভারতের জাতীয় সঙ্গীত। উরিতে সে সঙ্গীত এই প্রথম শোনা গেল।

দশ

উরির জয়ধ্বনি বাতাসে মিলিয়ে যাওয়ার আগেই কিন্তু এল নতুন দুঃসংবাদ। জম্মু থেকে।

জম্মু আর লাডাক,—দুই দিকে দুই পৃথক প্রদেশ, মাঝখানে তার কাশ্মীর, এই তিন নিয়ে মহারাজা হরি সিং-এর রাজ্য। জম্মুর প্রায় গায়েই পশ্চিম পাকিস্তানের বড় বড় শহর আর সেনানিবাস,—শেয়ালকোট, ওয়াজিরাবাদ ও মারি। সেখান থেকে হানাদারেরা করেছে আক্রমণ। এরই মধ্যে দখল করে নিয়েছে অনেকখানি এলাকা। খুন, লুট আর জখমের তো কথাই নেই।

কাশ্মীর প্রদেশে আক্রমণকারীরা সবাই ছিল বাইরের লোক। তাদের ঠেকানো সহজ। জম্মুতে দস্যুদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে কিছু স্থানীয় মুসলমান। তারা ঘরের শত্রু বিভীষণ। সব চেয়ে মারাত্মক। সর্দার ইব্রাহিম খান তাদের নেতা।

জম্মুতে মহারাজা হরি সিং-এর অধীনে পুঞ্চে ছিলেন এক মস্ত জায়গিরদার। তাঁর উপাধি রাজা। রাজার মতোই তাঁর প্রতাপ। রাজার মতোই তাঁর দান ও

দাক্ষিণ্য। ইব্রাহিম এই রাজারই প্রজা। ছাত্রকালে সে ছিল মেধাবী। খুশি হয়ে পুঞ্চের রাজা নিলেন তার লেখা পড়ার ভার। স্কুল থেকে কলেজ। কলেজ থেকে বিলাত। রাজার অর্থে ব্যারিস্টার হয়ে ইব্রাহিম ফিরে এল জম্মুতে। সেখানে শিক্ষিত মুসলমানের সংখ্যা নগণ্য। ছ' দিনেই তাদের নেতা হয়ে বসল নতুন ব্যারিস্টার।

ততদিনে পাঞ্জাবে মুসলীম লীগের পসার জমে উঠেছে। সাম্প্রদায়িক ঝড়ো হাওয়ায় হিন্দু-বিদ্বেষের পাল তুলে দিয়ে তারা ভাসিয়েছে ছই জাতিতত্ত্বের তরণী। তাই দেখে চতুর ইব্রাহিমের মাথায় গজালো ছুর্বুদ্ধি। আরও অনেক সুযোগ-সন্ধানীর মতো সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে চেপে বসল সে নৌকায়। যে রাজার টাকায় হয়েছে মানুষ তাঁরই বিরুদ্ধে শুরু করল ষড়যন্ত্র। কুৎসিৎ কৃতঘ্নতার এমন নির্লজ্জ দৃষ্টান্ত অতি অল্পই আছে ইতিহাসে।

ছুরাত্মার যেমন ছল, ছুষ্কর্মেরও তেমনি সহযোগীর অভাব হয় না কোনোদিনই। ইব্রাহিমেরও জুটলো দোসর। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী। আব্দুল কৈয়ায়ুম খান। তাঁর বর্ণ-বিবর্তনের কাহিনীও কম চমকপ্রদ নয়।

গোড়াতে কৈয়ায়ুম ছিলেন জাতীয়তাবাদী মুসলমান। দিল্লীতে কেন্দ্রীয় আইনসভার প্রথম সারিতে কংগ্রেস দলপতি ভুলাভাই দেশাই-এর পাশেই ছিল তাঁর আসন। তখন ইংরেজের সমালোচনা করতেন কঠোর ভাষায়।

সাম্প্রদায়িকতাকে বলতেন বিষ। দেশনেতাদের য়্যালবামে থাকতো তাঁর ছবি। স্বদেশী সভা সমিতিতে শোনা যেতো তার ভাষণ।

হঠাৎ একদিন তাঁর মতি হলো বদল, গতি হলো বিপরীত। যোগ দিলেন মুসলীম লীগে। রাতারাতি কংগ্রেসকে গাল দিতে লাগলেন এলোপাতাড়ি। গান্ধীকে বললেন,—ভণ্ড। নেহরুকে—গোঁয়ার। আর পেটেল? সে তো সাক্ষাৎ শয়তান, মুসলমানদের পয়লা নম্বর দুশমন।

কংগ্রেসের নেতারা তখন সবাই আমেদনগরে আগা খানের বাড়িতে বন্দী। তাঁরা পুরানো সহকর্মীর কীর্তি দেখে অবাক হয়ে ভাবেন, এ কী অঘটন!

কথায় বলে, জ্ঞাতি শত্রু বড় শত্রু, ভাই শত্রু মহাকাল। দলত্যাগীরাই হয় কালাপাহাড়। ভারতবর্ষের প্রতি আব্দুল কৈয়ায়ুম খানের রাগটাই যেন সব চেয়ে প্রচণ্ড। কাশ্মীর আক্রমণের পরিকল্পনা হয়েছে পেশোয়ারে, মূল পরিচালনাও সেখান থেকেই। সব কিছুরই পিছনে ছিল কৈয়ায়ুমের হাত। সর্দার ইব্রাহিম খান যোগাযোগ রাখল তাঁর সঙ্গে। অস্ত্র শস্ত্র যোগাড় করে করল বিদ্রোহ। বলল, "রাজা, মহারাজা মানিনে। আমরা নতুন সরকার গড়েছি। তার নাম,—আজাদ কাশ্মীর।"

মীরপুর, পুঞ্চ, নৌশেরা ও রাজৌরীতে ছিল মহারাজা

হরিসিং-এর ছাউনি। কিন্তু সেগুলিতে সৈন্য সংখ্যা যেমন অল্প, অস্ত্র শস্ত্রও তেমনি অপ্রচুর। তার উপরে সেখানে ভিড় করেছে পাকিস্তান থেকে পালিয়ে-আসা বহু হিন্দু ও শিখ শরণার্থী। অগণিত আহত ক্লান্ত ও সর্বস্বান্ত নরনারী। তাদের ক্ষুধার অন্ন আর বাসের ব্যবস্থাই দুরূহ। হানাদারেরা চার দিক থেকে ঘিরে ফেলল এই ঘাঁটিগুলিকে।

খবর পেয়ে ভারত সরকার সৈন্য পাঠালেন পুঞ্চের পথে।

কিন্তু পথ বলি তাকে কী মুখে? গহন ঘন বনের মাঝে এঁকে বেঁকে গিয়েছে কোনোমতে পায়ে চলার সরু রেখাটি। তাই বেয়ে আট হাজার ফুট উঁচু হাজি পীরের গিরিবর্ত্ম পার হয়ে বহু কষ্টে পুঞ্চের ছাউনিতে এসে পেঁছিলেন ব্রিগেডিয়র প্রিতম সিং ও তাঁর এক ব্যাটিলিয়ন সৈন্য।

সেখানে প্রথম সমস্যা খাদ্য। ওৎ-পাতা বাঘের মতো সহস্র সহস্র হানাদার ঘিরে বসে আছে শহরের সর্বদিক। সাধ্য কী যে তাদের এড়িয়ে বাইরে থেকে আসবে চাল ডাল তেল বা নুন। ভিতরে গৃহস্থদের গোলায় আর পাটোয়ারীদের আড়তে শস্য যা' ছিল তা' এসেছে ফুরিয়ে। বাইরে থেকে খাদ্য আমদানীর এক মাত্র উপায় বিমান। কিন্তু বিমান নামবে কোথায়? ছাউনিতে সৈন্য যারা আছে তারা হানাদারদের দূরে ঠেকিয়ে

রাখতেই হিমশিম। বিমান অবতরণের রানওয়ে গড়বে কখন? প্রিতম সিং ভেবে কূল পান না।

পুঞ্চে শরণার্থীদের মধ্যে ছিল এক হিন্দু ছুতোর। একদিন সে এসে হাজির হলো প্রিতম সিং-এর দপ্তরে। ব্রিগেডিয়র সাহেবের সঙ্গে দেখা করবে। আরদালী চাপরাসীরা প্রথমে হাঁকিয়ে দিতে চায়। শেষটায় অনেক বিনতি মিনতিতে মন নরম হলো তাদের। নিয়ে গেল প্রিতম সিং-এর সামনে।

বৃদ্ধ সেলাম করে বলল, "হুজুর, আমাকে কাজে লাগান।"

ব্রিগেডিয়র জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি বুড়ো মানুষ, কী কাজ করবে?"

বুড়ো উত্তর দেয়, "হাওয়াই জাহাজের জমি তৈরী করবো।"

প্রিতম সিং অবাক হয়ে বলেন, "রানওয়ে? তুমি তার কী জানো?"

বুড়ো বলে, "হুজুর কিছুই জানিনে, শুধু খাটতে জানি। আপনার এঞ্জিনীয়রেরা বানাবে নক্সা, রাজমিস্ত্রীরা গাঁথবে ইট। আমি মোট বয়ে যোগাবো মাটি, জল, চুন, সুরকী ও সিমেণ্ট।"

প্রিতম সিং-এর সন্দেহ ঘোচে না। বলেন, "সে কী কথা। তোমার এই অশক্ত শরীরে সে পরিশ্রম সইবে কেন?"

ছুতোরের চোখের কোণে জল দেখা দিলো। দু' হাত কপালে ঠেকিয়ে বলল, "মালিক, এই শক্ত হাড়গুলি অনেক সয়েছে। আমার জোয়ান দুই ছেলে মরেছে দাঙ্গাকারীদের হাতে, একমাত্র মেয়ে হয়েছে নিখোঁজ। রুগ্না স্ত্রীর হাত ধরে রাত্রির অন্ধকারে পায়ে হেঁটে এসেছি পাঁচ ক্রোশের পথ। আর ক'টা দিন বাঁচবো? কোন সুখেই বা বাঁচবো? মরার আগে যদি বিমানঘাঁটি তৈরীর কাজে কিছু মদদ দিতে পারি তবে জানবো আমার জিন্দ্‌গী সফল।"

বৃদ্ধকে কিছুতেই নিরস্ত করা গেল না।

পর দিন ভোর বেলা অনেক লোকের হট্টগোলে ঘুম ভাঙলো প্রিতম সিং-এর। জানালায় তাকিয়ে দেখেন, প্রায় হাজার দুই শরণার্থী। যুবক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ। ব্যাপার কী? সবাই রানওয়ে তৈরীর কাজে লাগতে চায়। বলে, "বুড়ো ছুতোর যদি পারে মোট বইতে, আমরা কি এতই অধম?"

অদম্য উৎসাহে কাজ শুরু হয়ে গেল রানওয়ের। ঝোপ-ঝাড় কেটে জমি হলো সাফ, দুরমুশ পিটিয়ে মাটি হলো শক্ত। ইট চুন সুরকী ঢেলে জায়গা হলো বিমান অবতরণের। রুগ্ন ও অশক্ত যারা, তারাও সাহায্য করল নানা ভাবে। সমর্থ লোকেরা কাজে চলে গেলে তারা কেউ আগলালো পড়শীদের ঘর সংসার, কেউ সামলালো তাদের ছেলে মেয়ে। এক মাসের কাজ সারা হলো এক

সপ্তাহে। পুঞ্চের অবরুদ্ধ অধিবাসীদের জন্যে আকাশ পথে আসতে লাগল নিত্যকার খাদ্যসামগ্রী।

হানাদারেরা ভেবেছিল, অনাহারের চাপে ছাউনির লোকেরা হার মানবে দু' দিনেই। তার আর সম্ভাবনা রইল না। অনেক শলা পরামর্শের পরে তারা তখন নিয়ে এল বড় এক বিলাতী কামান। তিন পয়েন্ট সাত হাউইটজার। পাহাড়ের উপর থেকে গোলা ফেলতে লাগলো ঠিক একেবারে রানওয়ের উপরে। বাধ্য হয়েই বিমান অবতরণ বন্ধ হলো সেখানে।

খাদ্যাভাব দেখা দিলো শহরে। রেশনের মাপ কমিয়ে দিয়ে চলে কিছু কাল। সেনাবাহিনীর লোকেরা নিজে কম খেয়ে শিশুদের খাবার যোগালো আরও কিছু দিন। তার পর ?

প্রিতম সিং তার সিগন্যালারদের ডেকে বললেন, "এ অসহ্য। পাহাড়ের উপর শত্রুপক্ষের কামানটাকে ঠাণ্ডা না করলেই নয়। বেতারে খবর পাঠাও সদর দপ্তরে। গোটা কয়েক দূর পাল্লার কামান পৌঁছে দিক এই ছাউনিতে। বাকি ভার আমাদের।"

খবর পাঠানো যত সহজ, কামান পাঠানো তত নয়। তবুও সদর দপ্তরের কর্তারা বললেন, "চেষ্টা করতে দোষ কী ?"

পঁচিশ পাউণ্ডার গোটা কয়েক কামান, গোলা বারুদ আর জনকয়েক গোলন্দাজ নিয়ে একদিন দুপুর বেলা

ঝিলম নদীর তীর

রওনা হলো বিমান বাহিনীর তিন খানা ডাকোটা। এয়ার কমোডোর মেহের সিং তখন কাশ্মীরে বিমান বাহিনীর কর্তা। তিনি ভাবলেন, এমন বিপজ্জনক কাজে পাইলটদের একা ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়। জেনারেল কুলবন্ত সিং সেখানকার সেনাবাহিনীর অধিকর্তা। তিনিও সঙ্গ নিতে চান। দুজনে চেপে বসলেন একখানা হাওয়ার্ড বিমানে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই চারখান বিমান এসে পৌঁছল পুঞ্চে। প্রথম ডাকোটাখানা যেই নামতে যাবে মাটিতে, অমনি পাহাড় থেকে হানাদারদের হাউইটজারটা গর্জে উঠল গুড়ুম গুড়ুম শব্দে। বাজ পড়ার আওয়াজে একটা বড় গোলা ফেটে পড়ল ডাকোটারই গা ঘেঁষে। বুঝি এক চুলের জন্যে বেঁচে গেল ডাকোটার ডান দিকের ডানাটা। মেহের সিং বুঝলেন, চেষ্টা নিরর্থক। এ ক্ষেত্রে বিমান-অবতরণ আত্মহত্যারই সামিল। বেতারে হুকুম দিলেন। সব বিমানগুলি ফিরে গেল সদর দপ্তরে। পুঞ্চের ছাউনিতে শরণার্থীরা হতাশচিত্তে ফেলল দীর্ঘ-নিঃশ্বাস। পাহাড়ের উপরে হানাদারদের ঘাঁটিতে উঠল হর্ষধ্বনি।

মেহের সিং-এর মাথায় ফন্দি খেলে অনেক। সন্ধ্যেবেলা তাঁর বাছাবাছা পাইলটদের ডেকে বললেন, "বন্ধুগণ, যে কাজ শুধু বলে হয় না, সে কাজ হয় কৌশলে। শত্রুর চোখে ধুলো দিয়ে কাজ হাসিল করতে হবে আমাদের।"

তিনি খুলে বলেন তাঁর মতলব। শুনে পাইলটরা সবাই মহাখুশি। তারা বয়সে তরুণ, নতুনত্বের নামে মেতে ওঠে, বিপদের ঝুঁকিতে হয় আরও বেশী বেপরোয়া।

পুঞ্চে সন্ধ্যা হয়েছে অনেকক্ষণ। শুক্লপক্ষের পঞ্চমীর আধখানা চাঁদ উঠেছে আকাশে। আধেক আলো আধেক ছায়া আবছা কুয়াশার মতো ঘিরেছে দূরে শালবনের সারি আর শালিধানের ক্ষেত। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে লেগেছে নিঝুম নীরবতার রেশ, ঘুম জড়িয়ে এসেছে বুঝি বনলক্ষ্মীর স্নিগ্ধ আনত দুটি নয়নের শ্যামল আঁখিপল্লবে।

অকস্মাৎ সেই নিস্তব্ধতার বুক চিরে ভেসে এল মেঘ গর্জন। না, মেঘ নয়,—বিমান। ভারতীয় বিমানবাহিনীর খান কুড়ি বিমান এসে পৌঁছল পুঞ্চের আকাশে। তার প্রথমটিতে পাইলট স্বয়ং মেহের সিং।

হানাদারদের গোলন্দাজরা তাড়াতাড়ি গোলা বারুদ বোঝাই করল কামানে।

কিন্তু এ কী? বিমানগুলি কেবলই চক্রাকারে ঘুরছে আকাশে। মাটিতে নামছে না তো! হানাদারেরা ভেবে পায় না এর অর্থ। স্পষ্ট দেখা যায় না সবগুলি, গুণে বোঝা যায় না তাদের সংখ্যা।

এই দেখা-অদেখা আর বোঝা-না-বোঝার সুযোগে আধ-আলো আধ-অন্ধকারের আড়ালে হঠাৎ হুশ করে নেমে পড়ল একখানা ডাকোটা। প্রিতম সিং-এর লোকেরা

আগেই তৈরী হয়েছিল বিমানঘাঁটির ভিতরে। তারা চক্ষের পলকে হাতে হাতে নামিয়ে ফেলল বিমান থেকে মাল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বিমানটি আকাশে উড়ে গিয়ে চক্রাকারে ঘুরতে লাগল অন্যান্য বিমানগুলির সঙ্গে। বাকি বিমানগুলির ঘোরা-ফেরা আর পাখার গর্জনে দূর থেকে ব্যাপারটা কারো চোখে পড়লো না।

এক, দুই, তিন। একে একে ডাকোটাগুলি নামল মাটিতে। একে একে সাজ সরঞ্জাম খালাশ করে দিলো শত্রুর অলক্ষ্যে। একে একে ঝাঁকের পাখীর মতো আবার উড়ে মিশে গেল দলে।

আধ ঘণ্টার মধ্যে তাঁর বিমান বাহিনী নিয়ে মেহের সিং বিজয় গর্বে ফিরে গেলেন তাঁর সদর আস্তানায়।

পাহাড়ের উপরে হানাদারেরাও মহাখুশি। হিন্দুস্থানের হাওয়াই জাহাজগুলি নামতেই সাহস করল না পুঞ্চে। কাফেরগুলি ভয় পেয়েছে খুব। বিলকুল ডরকে মারে ভাগ গয়া, হাঃ হাঃ হাঃ।

তাদের হাসি অবশ্য বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। পরদিন ভোর হতে না হতেই শুরু হলো পুঞ্চের ছাউনি থেকে পঁচিশ পাউণ্ডারের গোলা বর্ষণ। যেমন তার পাল্লা, তেমন তার আওয়াজ, আর তেমনি তার তেজ। হানাদারেরা তখন কামান বন্দুক সাজ সরঞ্জাম ফেলে প্রাণ নিয়ে পালাবার পথ পায় না।

এগারো

পুঞ্চ রক্ষা পেল, কিন্তু উদ্ধার হলো না। দুর্গ শক্ত হলো, মুক্ত হলো না। হানাদারেরা আগের ভাগেই দখল করে বসেছিল নৌশেরা ও তার আশেপাশের গ্রাম। ঘাঁটি করেছিল পাহাড়ের মাথায়। সেগুলি পুঞ্চের সেতুমুখ। সেখান থেকে তাদের হটাতে না পারলে পুঞ্চ উদ্ধার করা কঠিন।

কঠিন কাজের জন্য চাই কঠিন পণ। সেই পণ ছিল ব্রিগেডিয়র ওসমানের। পঞ্চাশ নম্বর প্যারা ব্রিগেডের অধিনায়ক হয়ে তিনি এসেছিলেন ঝানগড়ে। সেটা নৌশেরারই কাছাকাছি। হানাদারেরা সেখানে মর্টার ও মেশিনগান নিয়ে আক্রমণ করেছে প্রবল বেগে। ভারতীয় সৈন্যরা তাদের এঁটে উঠতে পারছে না।

উত্তর প্রদেশের আজমগড় জেলায় ওসমানের পৈত্রিক বাস। বেনারসে হরিশ্চন্দ্র কলেজ থেকে ম্যাট্রিক ও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি-এ পাশ করে যান বিলাতে। যুদ্ধবিদ্যা শিখতে। স্যাণ্ডহার্স্টের তিনিই শেষ ভারতীয় শিক্ষার্থী।

অতি তরুণ বয়সেই ওসমানের স্বভাবে ছিল অস্বাভাবিক

দৃঢ়তা। এক জাতীয় লোহা আছে যা' ভাঙা যায় কিন্তু বাঁকানো যায় না। তার সঙ্গে বুঝি ওসমানের মিল ছিল। আর ছিল তাঁর দেশাত্মবোধ। সজাগ এবং সুতীক্ষ্ণ। সাম্প্রদায়িকতাবাদী এক মুসলমান নেতা বিলাতে এক ভোজ সভায় বসেছিলেন ওসমানের ঠিক ডাইনে। নাম শুনে অত্যন্ত অন্তরঙ্গতার সুরে বললেন, "ও, আপনি জাতিতে মুসলমান ? আমিও তাই। বড়ই সুখের···"

বাধা দিয়ে ওসমান বললেন, "আমি জাতিতে ভারতীয়। হ্যাঁ, ধর্মের কথা যদি জিজ্ঞাসা করেন তো বলবো,—ইসলাম।"

নেতা সাহেবের মুখের আধখানা কথা রইল মুখে। সমুখের প্লেটে খাবারও আর তেমন রুচিকর বোধ হলো না।

ভারত বিভাগের সময় ওসমান ছিলেন পশ্চিম পাঞ্জাবের মুলতানে। সাম্প্রদায়িক নৃশংসতার বহু দৃশ্য দেখেছিলেন স্বচক্ষে। বহু বিপন্ন শিখ ও হিন্দুকে রক্ষা করেছেন স্বহস্তে। বুঝি তারই প্রভাব পড়েছিল তাঁর পরবর্তী জীবনে। গান্ধী-হত্যার পরদিন থেকে ওসমান মাছ-মাংস ছেড়ে দিয়ে হয়েছিলেন নিরামিষাশী।

ব্রিগেডিয়র ওসমান যে-দিন ঝানগড়ে সৈন্যদলের অধিনায়ক হয়ে এলেন, তার দু'দিন পরেই ঘটলো

ঝিলম নদীর তীর

ভারতীর বাহিনীর পরাজয়। তাদের পিছনে হটে আসতে হলো কয়েক মাইল। অন্য কেউ হয় তো মুষড়ে পড়তো এই প্রাথমিক বিফলতায়। ওসমানের বাড়লো জেদ। ভবিষ্যতে পাল্টা আক্রমণের উদ্যোগ আয়োজন করতে লাগলেন। কঠোর পরিশ্রমে ভরে তুললেন গোলা গুলী আর রসদের ভাণ্ডার। গড়ে তুললেন স্থানীয় বালকদের নিয়ে এক অসামরিক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। নিখুঁত করলেন খবর আনা নেওয়ার সিগন্যালিং ব্যবস্থা। নিজ সহকর্মী ও সেনাবাহিনীকে দিলেন আশা ও আশ্বাস। তাদের মনে জাগিয়ে তুললেন প্রত্যয় ও প্রতিজ্ঞা।

প্রথমে ওসমান হানাদারদের হাত থেকে কেড়ে নিলেন কোট। সামান্য একটি পাহাড়ী গ্রাম। কিন্তু অসামান্য তার সামরিক গুরুত্ব। নৌশেরা, ঝানগড়, রাজৌরী ও পুঞ্চের সড়কগুলি মিলেছে এসে ঐখানে।

কোটের পরেই দখল করলেন নৌশেরা।

হানাদারদের সদর ঘাঁটিতে সবাই প্রমাদ গণল। বড় কর্তারা চটে মটে কোটের সর্দারকে করলেন বরখাস্ত, নৌশেরার সেনাপতিকে করলেন কয়েদ। নতুন অধি-নায়কের অধীনে হাজার হাজার সৈন্য-সামন্ত দিয়ে পাঠালেন যুদ্ধে। হুকুম করলেন, আবার দখল করা চাই হারানো এলাকাগুলি। যে হেরে পালিয়ে আসবে তার যাবে গর্দান। হয় নৌশেরা, নয় তো শির।

নিকাশ করলে থাকে আরও এগারো জন। এই সংখ্যার জোরেই তারা ভারতীয় বাহিনীকে করল বিপন্ন। পঞ্চাশ গজের মধ্যে এগিয়ে এল। ক্রমশঃ কাছে। কাছের চাইতেও কাছে। আরও বেশী কাছে।

ব্রিগেডিয়র ওসমান গোড়াতেই বুঝেছিলেন, শত্রুসংখ্যা অগুণতি। তাঁর নিজের বাহিনীর চতুর্গুণ। তিনি সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছিলেন পিছনের ঘাঁটিতে। তিনি যুদ্ধ পরিচালনা করেন আর মুহূর্ত গোনেন। কতক্ষণে এসে পেঁছবে নতুন সৈন্যদল? ততক্ষণ যুঝতে পারবে তো তাঁর নিজের বাহিনী? রুখতে পারবে তো দুশমনকে?

বারে বারে ঘড়ি দেখছেন ওসমান। ঘড়ির কাঁটার সঙ্গেই পাল্লা তাঁর আর তাঁর সেনাবাহিনীর। কাঁটা যত এগিয়ে যাচ্ছে তত বাড়ছে আশঙ্কা, তত কমছে জয়লাভের আশ্বাস।

অবশেষে শত্রুসৈন্য এসে পড়ল আরও নিকটে। একেবারে ঘাড়ের উপরে। ওসমান অধীর হয়ে তাকাচ্ছেন ডাইনে, বাঁয়ে, পিছনে। সৈন্য, আরও সৈন্য চাই এই মুহূর্তে। কিন্তু কোথায় পাবেন সৈন্য? দেখলেন ছাউনির কারখানা ঘরে এঞ্জিনীয়রেরা করছে যন্ত্রপাতি মেরামত। হাঁক দিয়ে বললেন ব্রিগেডিয়র, "যেখানে যে আছো বন্দুক নিয়ে চলে এসো সমুখের সারিতে। কোনোমতে ঠেকিয়ে রাখো শত্রুকে।"

ঝিলম নদীর তীর

মরিয়া হয়ে হানাদারেরা নিশুতি রাতে আক্রমণ করল নৌশেরা। দক্ষিণ, পুব আর উত্তর,—তিন দিক থেকে এল তিন তিনটে বাহিনী। সব মিলিয়ে প্রায় হাজার পনেরো হানাদার। সঙ্গে তাদের বিলাতী রাইফেল, মাঝারি ও হাল্কা মেশিনগান, মর্টার ও গ্রেনেড। আধুনিক সামরিক পদ্ধতিতে আক্রমণের রকম দেখে বুঝতে কষ্ট হয় না, যুদ্ধের আসল পরিচালক কারা, কারা আছে কাশ্মীর হামলার পিছনে।

প্যারা ব্রিগেডের সৈন্যদল বিপুল বিক্রমে বাধা দিলো এই বিশাল শত্রুতরঙ্গ। হানাদারদের লক্ষ্য,—যে করেই হোক আবার দখল করবে নৌশেরা। ভারতীয় বাহিনীর পণ,—যে করেই হোক রক্ষা করবে নৌশেরা। কাশ্মীরের সংঘর্ষে এমন কঠোর ও এমন ভীষণ যুদ্ধ আর ঘটেনি। তু' দলই করেছে জান কবুল। যেন দংশনক্ষত শ্যেন বিহঙ্গ যুঝে ভুজঙ্গ সনে।

ব্রিগেডিয়র ওসমান নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে নিজের সেনাদলকে দিতে লাগলেন নির্দেশ। যেখানে দেখেন বিপদের একটুখানি আভাস, সেখানেই যান তিনি।

রাত শেষ হলো। যুদ্ধ শেষ হলো না। কাটলো তুপুর। তবু যুদ্ধের বিরাম নেই। বেলা গড়িয়ে গিয়ে অপরাহ্ণের ক্লান্ত সূর্য নামলো পাটে। তখনও চললো হানাহানি।

হানাদারদের শক্তি শৌর্যে নয়, সংখ্যায়। একজনকে

এঞ্জিনীয়রেরা হাতুড়ি ফেলে হাতে নিলো হাতিয়ার।

সরবরাহ বিভাগের কর্মীদের কাজ রসদ যোগানো। তারা থাকে আসল যুদ্ধক্ষেত্রের অনেক পিছনে। তাদেরও নামতে হলো যুদ্ধে।

ব্রিগেডিয়র ঘূর্ণির মতো ঘুরছেন তাঁবুতে তাঁবুতে। যাকে সামনে পান তাকেই যুদ্ধে পাঠান। "তুমি কে? রাঁধুনী? এখন রান্না থাক পড়ে। লড়াই করো। তুমি? মশাল্‌চি? কুছ পরোয়া নেই, হানাদারদের রোখো।"

যে লোকটা চিরকাল হিশাবের খাতা লেখে, খড়ি রেখে খাঁড়া ধরতে হলো তাকেও।

"সৎ শ্রী আকাল।"

পিছন থেকে শোনা গেল বহু কণ্ঠে শিখদের রণ-হুঙ্কার। নতুন সৈন্যদল এসে পৌঁচেছে এতক্ষণে। ইস্‌, আর একটুখানি, বুঝি পাঁচ মিনিট দেরি হলেই শেষ হয়ে যেতো সব। নির্মূল হয়ে যেতো ওসমানের সৈন্যদল। ফাঁড়া কেটে গেল যেন। যেন প্রায় কানের উপর দিয়ে গেল কোপ।

নতুন সৈন্যদলের সঙ্গে সঙ্গেই এল ভারতীয় বিমান বাহিনীর খান কয়েক বোমারু বিমান। মাটিতে শিখ-সৈন্যের আক্রমণ আর আকাশে বোমারু বিমানের গুলীবর্ষণ—এ-তু'-এর সামনে হানাদারেরা টিকে থাকবে কতক্ষণ?

সহস্র সহস্র হানাদারের মৃতদেহ পড়ে রইল মাঠে,

পথে, পাহাড়ের গায়ে, যেখানে সেখানে। ভারতীয় সৈন্যদের জয়ধ্বনিতে ক্ষণে ক্ষণে সচকিত হলো দূর ও নিকটের গিরিকন্দর। নৌশেরার যুদ্ধ হলো সারা। যে-পথ দিয়ে শত্রু এসেছিল, সে-পথ দিয়ে ফিরল নাকো তারা।

শুরু হলো নতুন অভিযান।

নৌশেরা থেকে ঝানগড়। পথে পড়ল গায়কোটের বন। শত্রুর চক্ষু এড়াতে ভারতীয় বাহিনীকে এগোতে হলো অতি সাবধানে। ঝোপ জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে। কখনও দৌড়ে, কখনও হেঁটে, কখনও হামাগুড়ি দিয়ে, কখনও বা কেবল বুকে চলে।

সৈন্যদল নিয়ে ওসমান পৌঁছলেন পৃথল পাহাড়ের সানুতে। শিকার-সন্ধানী নেকড়ে বাঘের মতো গোপনে। নিঃশব্দ পদসঞ্চারে। সবাই লুকিয়ে রইলেন বড় গাছের আড়ালে আবডালে।

হানাদারেরা অনেক দিন থেকেই ঘাঁটি গড়েছিল এই পাহাড়ে। উঁচু চূড়ার উপরে বসিয়েছিল হাল্কা ও মাঝারি মেশিনগান। কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে ঘিরেছিল চার পাশ যেখান দিয়ে পাহাড়ে ওঠার পথ, সেখানে ছিল সঙ্গীনধারী কড়া পাহারা।

পশ্চিমের আকাশে প্রদোষের ক্ষীণ আলো যখন গেল মিলিয়ে, শিশু গাছের মাথায় নামলো প্রথম অন্ধকার, শেয়ালকাঁটার বনে ঝিঁঝি পোকারা সমস্বরে

ধরলো তান, তখন আচম্বিতে একজন ভারতীয় সেপাই একটা গাছের ডাল থেকে লাফিয়ে পড়ল প্রথম পাহারাওয়ালার ঘাড়ে। শক্ত মুঠিতে গলা টিপে নিমেষে সাবাড় করলো তাকে। টুঁ শব্দটি করার অবকাশ পেলে না বেচারা। দ্বিতীয় প্রহরী ছিল খানিকটা দূরে। আর একজন সৈন্য গুটিগুটি এসে তাকে পিছন থেকে পিঠে বসিয়ে দিলো ঝকঝকে ধারালো ছুরি। সামান্য একটু গোঙানি শোনা গেল। তার পরেই সব নীরব, নিশ্চল। আল্লার নাম নেওয়ারও সময় মিললো না হতভাগার।

বাকি সৈন্যরা সব তখন আড়াল থেকে বেরিয়ে এল সামনে। যেন আলাদীনের প্রদীপ ঘর্ষণে পাষাণের বুক চিরে দেখা দিলো দৈত্যদল।

হানাদারেরা এমন অকস্মাৎ আক্রমণের জন্যে মোটেই তৈরী ছিল না। কিছুক্ষণ বাধা দিয়েই দেখালো পিঠ। ভারতীয় বাহিনী ঘাঁটি দখল করে দেখে, অস্ত্রশস্ত্রের তো কথাই নেই, জামা, জুতা ফেলে গিয়েছে অনেকে। রসুই ঘরে পড়ে আছে দিস্তা দিস্তা গরম চাপাটি, গামলা-ভরা সুরুয়া আর ডেকচি-ভরা বকরীর গোস্ত। হায় রে, বাছারা পালাবার তাড়ায় খাবারগুলি মুখে দেওয়ার সময় পায়নি এতটুকু।

ঝানগড়ের ঝাণ্ডাচকে আবার উড়তে লাগলো ভারতীয় নিশান। গ্যাসের আলো জ্বেলে সেই রাত্রিতে সেখানে

ঝিলম নদীর তীর

হলো সমুদয় বাহিনীর পুংক্তি ভোজন! গান, নাচ, হৈ-হল্লা—বিজয়ের আনন্দোৎসব। ঠিক ছ'মাস পঁচিশ দিন পরে ব্রিগেডিয়র ওসমানের ঘরে প্রথম বিছানা হলো খাটিয়ার উপরে। রাজপুত প্রতাপ সিং-এর মতো তিনিও প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যতদিন ঝানগড় উদ্ধার না হবে শত্রুর হাত থেকে, ততদিন ঘুমোবেন মেঝেতে।

নৌশেরা ও ঝানগড় যেন দেউড়ির ছুই গম্বুজ, দরজার ছুই পাটি। হাতছাড়া হওয়ায় প্রতিপক্ষ পড়ল বিপাকে। পাকিস্তান থেকে রসদ, অস্ত্র, শস্ত্র ও সৈন্য সরবরাহের রাস্তাগুলি পড়ল ভারতীয় কামানের পাল্লায়। হলো ভারতীয় গোলন্দাজদের সহজ নিশানা। রঙের টেক্কার মতো ঝানগড়ের ছাউনি যার হাতে, তারই হবে জিৎ। তাই দূর থেকে হানাদারেরা মাঝে মাঝে বোমাবর্ষণ করতে লাগলো ঝানগড়ের উপরে।

জুলাই মাসের আরম্ভ। সেদিন চার তারিখ। রাত্রিবেলা ঝানগড়ে শুরু হলো শত্রুর বোমাবৃষ্টি। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, ঈশান, বায়ু, অগ্নি, নৈঋত,—কোনো দিকে রইল না ফাঁক। ডুম্, দাম্, দড়াস্। মুহুর্মুহুঃ বোমা পড়তে লাগলো ভারতীয় ছাউনির উপরে। কালীপূজোর রাত্রিতে শত শত উড়ন তুবড়ি আর হাউই বাজির মতো আকাশের বুকে খেলছে শুধু আগুনের হল্কা।

সকল সঙ্কটে নিজ সৈন্যদের পাশে এসে দাঁড়ান

ঝিলম নদীর তীর

ব্রিগেডিয়র ওসমান। সেদিনও সেই অগ্নিবৃষ্টির মধ্যে তিনি আসা যাওয়া করছিলেন এক বাঙ্কার থেকে অন্য বাঙ্কারে। খোঁজ খবর নিচ্ছিলেন সবাকার। এমন সময় একটা বোমা ফেটে পড়ল তাঁর সামনে। একেবারে গায়ে বললেই হয়।

ছাউনির ডাক্তার ও শুশ্রূষাকারীর দল করল প্রাণপণ চেষ্টা। কিন্তু তাঁরা তো ওষুধ দিতে পারেন। প্রাণ দিতে পারেন না। রাত্রিশেষে আকাশের তারাগুলি যখন একে একে গেল নিবে, চাঁদ ঢাকা পড়ল পৃথল পাহাড়ের আড়ালে, তখন ভোরের স্নিগ্ধ মৃদু বাতাসে মিশে গেল ব্রিগেডিয়র ওসমানের শেষ নিঃশ্বাস। ঝানগড়ের ছাউনিতে কঠিন সৈনিকেরও চোখ হলো ছলোছল। খবর পেয়ে পাকিস্তানে উঠলো আনন্দরোল। পেশোয়ারে হানাদারদের শিবিরে হলো দীপালি।

পুষ্পস্তবকে সাজিয়ে বীরের মৃতদেহ বিমানযোগে নিয়ে আসা হলো নয়া দিল্লীতে। সেখানে হিন্দু, শিখ, খ্রীস্টান, পারসিক ও মুসলমানেরা শ্রদ্ধাভরে ফুল ছড়িয়ে দিলো শবাধারে। জাতীয় পতাকায় ঢেকে কামানের গাড়িতে হলো পূর্ণ সামরিক সম্মানে শবযাত্রা। শবানুগমন করলেন স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনীর তিন সর্বাধ্যক্ষ ও অন্যান্য প্রবীণ সেনানায়ক, মন্ত্রীসভার সমুদয় সদস্য ও প্রধান মন্ত্রী নেহরু। পথের দু'

ধারে নতমস্তকে দাঁড়িয়ে রইল সকল সম্প্রদায়ের সহস্র সহস্র নরনারী।

স্বাধীন ভারতে একমাত্র গান্ধীজির শবযাত্রা ছাড়া আর কারো মৃত্যুতে দিল্লীতে পড়েনি এমন সর্বজনীন বিষাদের ছায়া, ঘটেনি এমন রাষ্ট্রীয় শ্রদ্ধানিবেদন।

বারো

ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল ভারতীয় বাহিনীর জয়রথ। তার চাকার তলায় পিষে চূর্ণ বিচূর্ণ হলো হানাদারদের অভিলাষ, পাকিস্তানের সাধ এবং ষড়যন্ত্র। মুক্ত হলো কাশ্মীর উপত্যকা ও জম্মুর বহু শত্রুকবলিত অঞ্চল। গায়ের জোরে কাশ্মীর দখলের পরিকল্পনা হলো বিফল। শ্রীনগরের রাজভবনে পাকিস্তানী নিশান তোলার স্বপ্ন আর সফল হলো না।

ক্রমে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এল কাশ্মীরে। ব্যবসা বাণিজ্য আবার চলতে লাগলো হাটে বাজারে। আগের মতো স্কুল-কলেজে বসলো ক্লাশ, আপিস আদালতে শুরু হলো কাজকর্ম। ধীরে ধীরে আসতে লাগলো বাইরে থেকে দেশ-ভ্রমণকারীর দল। গুলমার্গের গালিচার মতো নরম সবুজ ঘাসের চত্বরে দেখা দিল ক্যাডির কাঁধে গলফের ব্যাগ চাপিয়ে পুরু টুইডের প্লাসফোর্স-পরা প্রৌঢ়ের দল। বরফ-জমা পাহাড়ের গা বেয়ে 'শী' করার উদ্দেশ্যে টাট্টু ঘোড়ার পিঠে চেপে খিলনমার্গের পথে রওনা হলো দুঃসাহসী তরুণ-তরুণীরা। ঝিলমের বুকে হাউসবোটগুলির বন্ধ ঝাঁপি খুলতে লাগলো একে একে। শিকারায় কাঠের

ঝিলম নদীর তীর

কারুকাজ, কাগজমণ্ডের সৌখীন কৌটা, আর বুটিদার শালের সওদা সাজিয়ে ফিরিওয়ালার দল ফিরতে লাগলো বিদেশী যাত্রীদের ছুয়ারে ছুয়ারে।

রাজধানীর বিপদ কাটলো। কিন্তু রাজার দিন ফুরিয়ে এল রাজত্বের। মহারাজা হরি সিং-এর সিংহাসনে পড়ল টান।

তেরো

রূপকথার রাজপুত্র রাজা হয়, মন্ত্রীপুত্র—সচিব, সওদাগরের ছেলে সপ্ত ডিঙায় সওদা সাজিয়ে সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে যায় বাণিজ্যে।

কাশ্মীরের অধিপতি হরি সিং কিন্তু রাজার পুত্র নয়,—ভ্রাতুষ্পুত্র। বুড়ো মহারাজ প্রতাপ সিং ছিলেন হরি সিং-এর জ্যাঠামশাই। নিজের ছেলে ছিল না। ভাইপোকে তিনি রাজত্ব দিয়ে গেলেন মরার পূর্ব মুহূর্তে। অনেকেই অবাক হয়েছিল।

অবাক হওয়ারই কথা। হরি সিং-এর বাপ অমর সিং ছিলেন মহারাজ প্রতাপ সিং-এর আপন সহোদর। শৈশবে এক মায়ের বুকের দুধ খেয়েছেন, একসঙ্গে করেছেন খেলা, সন্ধ্যাবেলায় একই আইমার কাছে বেঙ্গমা-বেঙ্গমীর গল্প শুনে ঘুমিয়ে পড়েছেন পাশাপাশি পালঙ্কে। কৈশোরে এক শিক্ষকের কাছে নিয়েছেন পাঠ, যৌবনে একত্রে গিয়েছেন মৃগয়ায়। কিন্তু বড় হয়ে তিনিই হলেন বৈরী। সিংহাসনের লোভে ভাই-এর বিরুদ্ধে দাঁড়ালো

ভাই। প্রতাপ সিংকে সরিয়ে নিজে রাজা হওয়ার চক্রান্ত করলেন অমর সিং। সে-কাহিনী জানতে হলে তাকাতে হবে অনেক পিছনে, একবার চোখ বুলিয়ে নিতে হবে পুরানো ইতিহাসের ধুলো-জমা পাতায়।

সে প্রায় এক শ' বছর আগেকার কথা। পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিং তখন শিখ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর। তাঁর সৈন্যদলে ছিল এক তরুণ সেনানায়ক। ডোগরা রাজপুত গোলাব সিং। যেমন বীর তেমনি চতুর। খুশি হয়ে মহারাজ রণজিৎ সিং তাঁকে দান করলেন জম্মু প্রদেশ। সেনাপতি গোলাব সিং হলেন রাজা গোলাব সিং।

ধীরে ধীরে বাড়তে লাগলো জম্মু রাজ্যের সীমানা। গোলাব সিং যোগ করলেন বালটিস্থান, জয় করলেন লাডাক। তাঁর তলোয়ার আর বুদ্ধি, দুই-ই সমান ধারালো। তাঁর বুঝতে দেরি হলো না যে, মোগলরাজ্যের দিন ফুরিয়েছে, আশা নেই শিখ সাম্রাজ্যের, ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের একছত্র অধিপতি হবে ইংরেজ। ততদিনে রণজিৎ সিং-এর মৃত্যু ঘটেছে লাহোরে।

উদ্যোগী পুরুষকে সুযোগ দেন লক্ষ্মী, বুদ্ধিমানেরই সহায় হয় ভাগ্য। সীমান্ত যুদ্ধে বিব্রত হয়ে ইংরেজ সাহায্য চাইলো গোলাব সিং-এর কাছে। রাজা ইংরেজ সৈন্যদলকে অকাতরে দিলেন অর্থ, দিলেন আহার, দিলেন আশ্রয়। চার বছর পরে ইংরেজ শিখ সৈন্য পরাজিত করে লাহোর

দখল করলো। অমৃতসরের সন্ধিসূত্রে প্রায় দু' কোটি টাকা দিয়ে রাজা গোলাব সিং পেলেন জম্মুর পাশাপাশি সমুদয় পাহাড়ী এলাকা। তার সীমানা সিন্ধু নদের পুব দিক থেকে রবি নদীর পশ্চিম তীর অবধি বিস্তৃত। তার মধ্যে আছে কাশ্মীর আর গিলগিট।

গোলাব সিং নতুন রাজ্যের অধিকার পেলেন, কিন্তু দখল পেলেন না। কাশ্মীরের শাসনকর্তা শেখ ইমামুদ্দিন কাউকে কাছেই ঘেঁষতে দেয় না। অবশেষে জম্মু থেকে রওনা হলো সৈন্যদল। যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে ইমামুদ্দিন মানলো হার। কাশ্মীরের সিংহাসনে বসলেন মহারাজা গোলাব সিং।

গোলাব সিং-এর মৃত্যুর পরে রাজা হলেন তাঁর পুত্র রণবীর সিং। বাপের ধারা বজায় রাখলো ছেলে। বহুভাবে সাহায্য করলেন ইংরেজকে। সিপাহী বিদ্রোহের সময় সৈন্য পাঠিয়ে রক্ষা করলেন অনেক ইংরেজপ্রাণ।

কিন্তু দুর্দিনের বন্ধুকে সুদিনে মনে রাখা ইংরেজের স্বভাব নয়। বিপদ কেটে যেতেই ইংরেজ ভুলে গেল ডোগরা রাজবংশের উপকার। ততদিনে বড়লাট ও অন্যান্য ইংরেজ বড়কর্তারা জানতে পেরেছেন কাশ্মীরের সামরিক গুরুত্ব। বুঝেছেন, আফগান ও চীন এবং জারের রাশিয়াকে রুখতে হলে গিলগিটে রাখা চাই ইংরেজ ঘাঁটি। কাশ্মীর হাতছাড়া করে নিজের হাতে নিজেদের

স্বার্থ হানি করেছেন,—এ কথা ভেবে তাঁদের আপসোসের আর শেষ রইল না।

তখন শুরু হলো নানা কূটকৌশল। নানা ছলে ইংরেজ নিজ কর্তৃত্ব বহাল করতে চাইলো কাশ্মীরে।

রণবীর সিং-এর বড় ছেলে প্রতাপ সিং নেহাতই নিরীহ মানুষ। রাজা হয়েও জপ, তপ, পূজো-অর্চনা নিয়েই সময় কাটান বেশী। সুযোগ পেয়ে ইংরেজ কাশ্মীরে বসালেন এক রেসিডেন্সী, মানে—নিজেদের এক খবরদারি-আপিস। তার কর্তা হয়ে এলেন স্যার অলিভার সেণ্ট জন্—কাশ্মীরের প্রথম রেসিডেণ্ট।

কথামালার উট জানতো, জানালা দিয়ে একবার নাক গলাতে পারলে আস্তে আস্তে গোটা ঘরটা দখল করতে দেরি হয় না। সে কৌশল ইংরেজ রেসিডেণ্টদের অজানা ছিল না। বিশেষ করে রেসিডেণ্ট প্লৌডেন লোকটা ছিল যেমন খল, তেমনি ধড়িবাজ। সে মহারাজের দরবারের কাউকে দেখালো লোভ, কাউকে দেখালো ভয়। হু'হাতে ঘুষ দিয়ে একে একে হাত করলে কর্মচারীদের অনেককে। মহারাজার রাজস্বমন্ত্রী গোপনে যোগ দিল প্লৌডেনের দলে।

একদিন সকাল বেলা মহারাজ প্রতাপ সিং আহ্নিকে বসেছেন। এমন সময় ছোট ভাই অমর সিং এসে বললেন, "দাদা, বাইরে এস ; জরুরী কথা আছে।"

ঝিলম নদীর তীর

পূজোর আসনে বসে কথা বলা চলে না। মহারাজ ইসারা করে বোঝালেন, আহ্নিক শেষ হতে তখনও কিছু বাকী।

অমর সিং চড়া মেজাজে বললেন, "নিকুচি করেছে তোমার আহ্নিক। পারো তো, আগে রাজ্য সামলাও, পরে করো পূজো-পার্বণ। নিজের মাথা বাঁচাতে পারলে, ঠাকুর দেবতার মাথায় গঙ্গাজল ঢেলো ঘটি ঘটি।"

মহারাজ ব্যস্ত হয়ে ঠাকুর দালানের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "ব্যাপার কী?"

অমর সিং বললেন, "এখানে নয়। চল শোবার ঘরে।" সাবধানে সমস্ত দোর জানালা বন্ধ করে চুপি চুপি অমর সিং দিলেন সংবাদ। নিদারুণ দুঃসংবাদ।

ইংরেজ রেসিডেন্টের হাতে ধরা পড়েছে অনেকগুলি গুপ্ত চিঠি। সমস্তই মহারাজ প্রতাপ সিং-এর নিজ হাতের লেখা। রাশিয়ার সঙ্গে ইংরেজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছেন তিনি। রেসিডেন্ট প্লোডেনকেও গোপনে হত্যা করার চেষ্টায় আছেন মহারাজ।

শুনে মহারাজার দুই চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো। বললেন, "এ শুধু মিথ্যে অপবাদ দিয়ে আমাকে রাজ্যচ্যুত করার চক্রান্ত।"

অমর সিং বললেন, "চক্রান্ত?"

মহারাজ বললেন, "হ্যাঁ তাই, আর সে চক্রান্তে আছ তুমি।" ছোট ভাই-এর দুই হাত ধরে মহারাজ

কাতরভাবে অনুনয় করলেন, "ভাই, তুমি কাশ্মীরের গদিতে বসতে চাও, আমি জানি কিন্তু এমন অধর্ম ভগবান সইবেন না, এমন ক[illegible] করো না।"

অমর সিং আমতা আমতা করে বললেন, "আমি—ইয়ে—চক্রান্ত—সে কি কথা—মানে— !" তাঁর মুখে আর কথা যোগালো না। তাড়াতাড়ি সরে পড়লেন মহারাজার সমুখ থেকে।

মহারাজার বুঝতে বাকী রইলো না যে, রেসিডেন্ট প্লৌডেন ও ভাই অমর সিং মিলে তাঁর চারদিকে জাল পেতেছে—বিষম ফাঁদ। কিন্তু কি করে পরিত্রাণ পাবেন ভেবে না পেয়ে ফাঁদে আটকে-পড়া শিকারের মতোই তিনি অসহায়ভাবে শুধু ছটফট করতে লাগলেন। অবশেষে মহারাণীকে বললেন, নিজের ভাই যখন শত্রু হয়েছে তাঁর, তখন পরিত্রাণের চেষ্টায় আর কী ফল? অদৃষ্টে যা আছে তাই হোক।

সেদিন থেকে অন্ন-জল ত্যাগ করলেন প্রতাপ সিং।

রেসিডেন্ট তৈরী করলো এক 'ইরসাদ'। তাতে লেখা, মহারাজ প্রতাপ সিং স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করছেন। রাজ্য সুশাসনের জন্য ভারত গভর্নমেণ্ট যেন ব্যবস্থা করেন অবিলম্বে।

মহারাজ প্রথমে অস্বীকার করলেন সে চিঠিতে সহি করতে। কিন্তু অমর সিং ভয় দেখাতে লাগলেন অবিরত। শেষকালে তিন দিন উপবাসে ক্লান্ত অবসন্ন দেহে নিরুপায়

প্রতাপ সিং দিলেন দস্তখত। নিজ হাতে স্বাক্ষর করলেন নিজের বরখাস্ত পরোয়ানায়।

রাজ্য শাসনের ভার নিল এক নতুন মন্ত্রণা পরিষদ। সে পরিষদের সভাপতি হিসাবে তার প্রকাশ্য প্রধান হলেন রাজা অমর সিং। অপ্রকাশ্য কর্তা রইলেন অবশ্য রেসিডেন্ট প্লৌডেন। গিলগিটে দুর্গ তৈরী হলো ইংরেজের। তাতে কামান, বন্দুক নিয়ে জাঁকিয়ে বসলো ব্রিটিশ রেজিমেণ্ট,—গোরা সৈন্যদল।

নিজের রাজ্যে নিজ রাজপ্রাসাদের এক কোণে প্রায় বন্দী হয়ে রইলেন অক্ষম, অসহায়, অবজ্ঞাত, গদিচ্যুত মহারাজ। প্রতাপহীন প্রতাপ সিং।

নিরাশায় নিরানন্দে তাঁর দিনগুলি মনে হয় দীর্ঘ। মাসের বুঝি শেষ নেই, বছর যেন সংখ্যাহীন, অনাদি, অনন্ত। অবশেষে মরিয়া হয়ে মহারাজ নিজ হাতে এক চিঠি লিখলেন বড়লাট লর্ড ল্যান্সডাউনের কাছে। সে পত্রের ভাষা অনিপুণ, রচনা অপটু, কিন্তু ভাব সরল ও সুস্পষ্ট। তিনি বললেন, রাশিয়ার সঙ্গে ষড়যন্ত্রের কথা আগাগোড়া মিথ্যা। রেসিডেন্ট যে চিঠিগুলি দেখিয়েছেন, সেগুলি সমস্তই জাল। হয় মহারাজকে তাঁর নিজ সিংহাসন ফিরিয়ে দেওয়া হোক, নয় তো বুকের মাঝখানে গুলী করে তাঁকে হত্যা করা হোক। এমন অবমানিত লাঞ্ছিত জীবন আর তিনি সইতে পারছেন না।

ঝিলম নদীর তীর

হঠাৎ একদিন কলকাতার এক খবরের কাগজে বেরুলো এক সরকারী দলিলের হুবহু নকল। তাতে প্রকাশ হয়ে গেল কাশ্মীরে ইংরেজের কীর্তিকাহিনী, রেসিডেণ্ট প্লৌডেনের কারসাজি। পার্লামেণ্টে উঠলো তরঙ্গ। উদারনৈতিক সদস্য চার্লস ব্র্যাডলো মহারাজের পক্ষ নিলেন। উইলিয়ম ডিগবী ছিলেন সেকালের একজন ন্যায়নিষ্ঠ ইংরেজ। তিনি মহারাজের প্রতি অবিচারের নিন্দা করলেন জোরালো ভাষায়। অগত্যা ভারত সরকার মহারাজকে তাঁর শাসন-ভার ফিরিয়ে দিলেন। পনেরো বছর পরে আবার কাশ্মীরের সিংহাসনে বসলেন মহারাজ প্রতাপ সিং।

তারপরে আরও কুড়ি বছর বেঁচেছিলেন তিনি। তাঁর আগেই অমর সিং গেলেন মারা। যুবক হরি সিং হলেন মহারাজের মন্ত্রীসভার একজন সদস্য।

প্রতাপ সিং-এর পাটরাণী বললেন, "পুষ্যিপুত্র নেবো আমি। আর যাই হোক, বিশ্বাসঘাতক অমর সিং-এর ছেলেকে বসতে দেবো না সিংহাসনে।"

প্রতাপ সিং কিন্তু চুপ করে থাকেন। তাঁর মনের কথা কেউ জানতে পায় না।

ক্রমে মহারাজের চুলে ধরলো পাক, চোখে পড়লো ছানি। বায়ু, পিত্ত, কফ কুপিত হয়ে বাধলো বিষম ব্যাধি। শয্যা নিলেন তিনি। রাজবৈদ্য এসে নাড়ী দেখেন দু'বেলা, চরক ও সুশ্রুতের শ্লোক আউড়ে বড়ি ব্যবস্থা করেন নানা

রঙের, ত্রিফলার জল আর মধু দিয়ে মেড়ে খাওয়ানো হয় প্রহরে প্রহরে।

বৃথা। মহারাজের রোগের উপশম নেই। প্রতাপ সিং বুঝলেন, তাঁর অন্তিমকাল আসন্ন। পাত্র মিত্র, সভাসদদের ডাকলেন কাছে। ভ্রাতুষ্পুত্র হরি সিং-এর মাথায় হাত রেখে বললেন, "সবাই জেনে রাখো, এই আমার উত্তরাধিকারী, জম্মু ও কাশ্মীরের ভাবী অধীশ্বর।"

মহারাণী ছিলেন পাশে।—তিনি ডুকরে কেঁদে উঠলেন,—

"হায়, কি করলে মহারাজ? শেষকালে অমর সিং-এর ছেলেকেই দিলে রাজ্যভার!"

সে প্রশ্নের জবাব মিলল না। প্রতাপ সিং ততক্ষণে চোখ বুজেছেন। সে চোখ আর খোলেন নি।

সিংহাসনে বসে মহারাজ হরি সিং প্রথমে মন দিলেন প্রজার কল্যাণে। রাজ্যের বড় চাকরিগুলি যাতে বিদেশীরা না দখল করে সেজন্যে করলেন আইন, কর্মচারীরা যাতে কাজে ফাঁকি না দেয় সেদিকে রাখলেন কড়া নজর। গ্রামে গ্রামে ঘুরে স্বচক্ষে দেখতে লাগলেন চাষী মজুরদের অবস্থা। ঝিলমে বান এলে শিকারা নিয়ে নিজে উদ্ধার করতে লাগলেন বন্যার এলাকা থেকে বিপন্ন নরনারীর দল। বিলাতে গোলটেবিল বৈঠকে গিয়ে বক্তৃতা দিলেন,—ভারতবর্ষের শাসন কর্তৃত্ব দেওয়া উচিত ভারতীয়দেরই হাতে। একজন দেশীয় রাজার মুখে এমন কথা এর আগে কেউ কখনও শোনেনি।

ঝিলম নদীর তীর

ইংরেজ গভর্নমেণ্ট খুশি হলেন না। কাশ্মীরে পুরোপুরি ইংরেজ কর্তৃত্ব না থাকায় তাঁরা তুষ্ট ছিলেন না। এখন রুষ্ট হলেন। কাশ্মীরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করলেন তাঁরা।

উপায় ছিল সহজ। কাশ্মীরের প্রজারা অজ্ঞ মুসলমান। তাদের সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি উস্কে দিতে কতক্ষণ? ওয়েকফিল্ড নামে এক ইংরেজ ছিল মহারাজ হরি সিং-এর মন্ত্রী। তারই মারফতে মুসলমানদের ক্ষেপিয়ে তোলা হলো কাশ্মীর ও জম্মুতে। রাজ্যের বাইরে থেকে সে অসন্তোষের আগুনে যোগানো হলো প্রচুর ইন্ধন। মুসলমানদের নির্যাতন করছে হিন্দু মহারাজ আর তার হিন্দু কর্মচারীরা,—এই বলে' চেঁচাতে লাগলো পাঞ্জাবের অর্হর আর আহম্মদীয়া দলের নামজাদা সাম্প্রদায়িক মুসলমানেরা আর তাদের দলের উর্দু খবরের কাগজগুলি।

লাহোরের দৈনিক শিয়াশৎ পত্রিকা খোলাখুলি কাশ্মীরী মুসলমানদের কাছে জানালো আবেদন,—আল্লার নামে শপথ নিয়ে তারা জান কবুল করুক। ইসলামের মান রাখতে তারা কোতল করুক দুষমনদের, সাবাড় করুক বিধর্মী সরকার। পত্রিকার হাজার হাজার সংখ্যা, রোজ বিনামূল্যে হলো বিতরণ শ্রীনগর, সপুর, বিজবিহারা ও অন্যান্য শহরে। গুপ্ত প্রচার পুস্তিকা "কাশ্মীরী মজলুস" আর 'মকতুবি কাশ্মীর" ছড়িয়ে পড়ল হাটে বাজারে, মজলিসে, মসজিদে। সুদূর পাড়াগাঁয়ের

ঝিলম নদীর তীর

মক্তব মাদ্রাসার মুসলীম ছাত্রমহলে। আসতে লাগলো অসংখ্য, কখনও ডাকে, কখনও বা হাতে হাতে। সেগুলির ছাপার কালি লাল, লেখার ভাষা হিংস্র। পড়লে নেহাত শান্ত মানুষেরও রক্ত তেতে ওঠে, মাথায় চাপে খুন।

রাজ্যের ভিতরে আন্দোলনের নেতা হলেন এক তরুণ শিক্ষিত মুসলমান।

তাঁর নাম—শেখ মহম্মদ আব্দুল্লা।

চৌদ্দ

কাশ্মীরের এক সাধারণ গৃহস্থ ঘরে জন্ম হয়েছে শেখ আব্দুল্লার। তাঁর বাপ তৈরী করতেন পশমী শাল। মা রান্না করতেন, ঘর নিকোতেন, বিকালে হাটে বেচার জন্যে উদুখলে কুটতেন শালী ধানের চিড়া। স্কুলের পাঠ সাঙ্গ হলে আব্দুল্লা কলেজে পড়তে যান লাহোরে। সেখান থেকে আলীগড়।

ভারতবর্ষের হিন্দু মুসলমানে বিরোধের বীজ বুনেছে ইংরেজ। তার জমি তৈরী হয়েছে আলীগড়ে। আলীগড় মুসলীম কলেজের সাহেব অধ্যক্ষ মিস্টার বেক আর থিওডর মরিসন সে মাটিতে যুগিয়েছেন সার ও জল। যত্নে বাড়িয়ে তুলেছেন সাম্প্রদায়িক হিংসার চারা গাছ। সরকারী উৎসাহ আর উস্কানির আলো হাওয়ায় শাখা প্রশাখা মেলে পরে সে হয়ে দাঁড়িয়েছে বিরাট বিষবৃক্ষ। সর্বাঙ্গে তার কাঁটা। সে গাছের ছায়াতে বসে যে নিয়েছে পাঠ, সেখানকার ঘাসের উপরে যে চলেছে পথ, সেখানকার বাতাস থেকে যে নিয়েছে নিঃশ্বাস সে কি হবে সাক্ষাৎ প্রেমাবতার? মরুর দেশে কি ফুটবে নাগ কেশরের ফুল। আলীগড়ের ছাত্র শেখ আব্দুল্লা

যে কাশ্মীরে ফিরে মুসলমানদের ক্ষেপিয়ে তুলবেন হিন্দু বিদ্বেষে তাতে আর আশ্চর্য কী?

তিনি প্রথমে ফতেকদলে স্থাপন করলেন এক মুসলীম পাঠাগার। সেখানে রোজ সন্ধ্যায় যে সব তরুণ পড়তে আসতো তাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে লাগলেন গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে অসন্তোষ। শ্রীনগরের শাহহামদানের মসজিদে জুম্মার নামাজে বড় জমায়েত হয়। তাতে দিতে লাগলেন উত্তেজক বক্তৃতা। অজ্ঞ মুসলীম জনসাধারণ মোল্লাদের কথায় ওঠে বসে। চতুর আব্দুল্লা শ্রীনগরের প্রধান মীরওয়েজ মৌলানা ইউসুফ শাহকে দলে টানলেন। তাঁর ফতোয়া হাতে নিয়ে গ্রামে গ্রামে গড়ে তুললেন নিজ সমর্থকের সংঘ।

কাশ্মীরের রাজকর্মচারীদের মধ্যেও অনেক ছিল বুদ্ধিহীন। তাদের হঠকারিতায় মুসলীম জনগণের বিক্ষোভ ক্রমেই বেড়ে চললো।

এই সময়ে হরি সিং-এর ঘটলো মতিভ্রম। খ্রীস্টানরা বলেন, ভগবান যাকে মারতে চান, আগের ভাগে তার বুদ্ধি দেন গুলিয়ে। মহারাজ রাজশাসনের বদলে মাতলেন প্রমোদ ভ্রমণে। রাজকার্য গেল চুলোয়, প্রজাহিতের কথা তোলা রইল শিকায়। আজ লণ্ডন, কাল প্যারিস, পরশু রিভিয়ারায় কাটে তাঁর দিন। সেখানে তাঁর কীর্তি কলাপ মাঝে মাঝে প্রায় কেলেঙ্কারীর কোঠায় গিয়ে ঠেকে। বিদেশে বিলাস ব্যসনের সহস্র ছিদ্রপথে দ্রুত শূন্য হয়ে

আসে রাজকোষের সুবর্ণ ঝারিটি। তলানি সামান্য যেটুকু থাকে সেটুকুও লাগে আমলা গোমস্তার ভোগে। তখন তারা টাকার তাগিদে দরিদ্র প্রজার গলায় ট্যাক্সের ফাঁসে আরও কষে লাগান টান।

ফল ফলতেও দেরী হলো না। অতি সামান্য ঘটনাকে উপলক্ষ্য করেই ঘটলো বিপর্যয়। বারুদের স্তূপে একটি ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গই তো বৃহৎ বিস্ফোরণের পক্ষে যথেষ্ট।

ইংরেজী ১৯৩১ সাল। মে মাসের মাঝামাঝি। জম্মুর পুলিশ ব্যারাকে সেদিন একজন মুসলমান পুলিশ কাজে হাজির হয়নি। তার উপরওয়ালা,—লাভরাম হিন্দু। কাশ্মীরী পণ্ডিত। তিনি এসে দেখেন, লোকটা বিছানায় শুয়ে দিব্যি আরামে ঘুমোচ্ছে। শাসন করতে গেলে সে উল্টে লাভরামকেই গাল মন্দ শুরু করল। রাগে লাভরাম পুলিশের বিছানাটা টান মেরে ফেলে দিলেন ঘরের মেঝেতে। বালিশের তলায় ছিল পবিত্র কোরানশরীফের কয়েকটি পৃষ্ঠা, তা ছিটকে পড়ল মাটিতে।

কী! এত বড় স্পর্ধা। কাফেরের হাতে কোরানের হতাদর? বিধর্মী করে ইসলামের অপমান? ফতেকদলের পাঠাগারে গর্জে উঠল শেখ আব্দুল্লা আর তাঁর সমস্ত দল বল। জম্মু ও কাশ্মীরে যেখানে যত মুসলমান ছিল তাদের সবার কানে পৌঁছে দিল তারা এই খবর। ধূমায়িত অসন্তোষের অগ্নিতে পড়ল ঘৃতাহুতি।

গভর্নমেণ্ট বুঝলেন ব্যাপার গুরুতর। তাঁরা মন্ত্রীসভার এক সদস্যকে দিলেন তদন্তের ভার। সাক্ষ্য প্রমাণে বোঝা গেল লাভরামের দোষ নেই। বিছানার ভিতরে যে ছিল ধর্মগ্রন্থ, তা তার জানা ছিল না। তবুও মুসলীম সম্প্রদায়কে খুশি করতে লাভরামকে দেওয়া হলো চাকরি থেকে অবসর। অবাধ্যতার অপরাধে অবশ্য মুসলীম পুলিশটিকে করা হলো বরখাস্ত।

মুসলীম জনমত শান্ত হলো না। শেখ আব্দুল্লা এক সভা ডাকলেন শ্রীনগরে খান কোয়াইমুল্লার চত্বরে। সেখানে হাজার হাজার উত্তেজিত মুসলমানের কাছে হিন্দু মহারাজ, তাঁর হিন্দু কর্মচারী ও হিন্দু প্রজাদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে বক্তৃতা দিল এক পাঠান। নাম আব্দুল কাদের। লোকটা এক ইংরেজের রাঁধুনী—বাবুর্চী। মনিবের সঙ্গে সদ্য এসেছে শ্রীনগরে। গভর্নমেণ্ট সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করলেন।

তেরোই জুলাই শ্রীনগর সেণ্ট্রাল জেলে আব্দুল কাদেরের বিচারের দিন। সকাল থেকেই জেলের দরজায় জড়ো হতে লাগলো জনতা। দলে দলে মুসলমান ছোট বড় শোভাযাত্রায় পৌঁছল এসে নানা অঞ্চল থেকে। তারা চেঁচাতে লাগলো, আব্দুল কাদের শহিদ। তাদের মুহুর্মুহুঃ হুঙ্কারে কাঁপতে লাগল জেলখানার দরজা জানালা।

অবশেষে বাঁধভাঙা জলস্রোতের মতো বিক্ষোভকারীর দল ঢুকে পড়ল জেলের আঙিনায়। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট

আর তার সহকর্মীরাও চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিলেন। জনতাকে বুঝিয়ে শান্ত করার কিছুমাত্র চেষ্টা না করেই করলেন গুলী বর্ষণ। নিহত হলো জন দশেক, আহত ততোধিক।

কোথাও আর কোনো মাত্রা রইল না। মৃতদেহ নিয়ে মিছিল করে বিপুল জনতা রওনা হলো গোরস্থানে। দশ হাজার ক্রুদ্ধ মুসলমানের শোভাযাত্রার প্রথম সারিতে ছিলেন পাঠাগারের নেতারা। তাদের হাতে আহতদের রক্তমাখা জামা কাপড়ে তৈরী বৃহৎ পতাকা। মুখে মহারাজার বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক ধ্বনি। শোভাযাত্রা তো নয় যেন আগ্নেয়গিরি থেকে নির্গত তপ্ত লাভার স্রোত। প্রধান রাজপথ দিয়ে জনস্রোত এসে পৌঁছলো মহারাজগঞ্জের বাজারে। সেটা রাজধানীর সব চেয়ে বড় ব্যবসায় অঞ্চল। মুহূর্তে উত্তেজিত জনতা ঝাঁপিয়ে পড়ল পথচারী হিন্দু স্ত্রী পুরুষের উপর। শ্রীনগরে শুরু হলো ভয়াবহ দাঙ্গা। দেখতে দেখতে হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়ল বিচরনগ, এবং শহরের আরও অন্যান্য এলাকায়।

হিন্দু দোকান পসার হলো লুট, হিন্দু বাড়ি-ঘর হলো পুড়ে ছাই। তিনজন হলো খুন, এক শ' তেষট্টি জন জখম। দাঙ্গাকারীরা থানা করল তছনছ, টেলিফোনের লাইন করলো খান্‌খান্‌।

ওয়েকফিল্ড তখন কাশ্মীরের দেওয়ান। দাঙ্গার সময়ে তিনি হলেন নিখোঁজ। ক্রিং ক্রিং শব্দে মুহুর্মুহুঃ

টেলিফোন বাজছে তাঁর বাংলোতে। ভয়ার্ত হিন্দুরা জানাচ্ছে ধন, প্রাণ, মর্যাদা রক্ষার কাতর আবেদন। পুলিশ, ম্যাজিস্ট্রেট, সরকারী কর্মচারীরা চাইছে নির্দেশ। ওয়েকফিল্ডের বেয়ারা টেলিফোন ধরে কেবলি বলছে, "সাহেব কোঠিমে নেহি হৈঁ"।

কখন ফিরে আসবে?

তা সে জানে না, "নেহি মালুম"।

শেষটায় ছাউনি থেকে মহারাজার সৈন্যদল এসে গুলী করে থামালো দাঙ্গাহাঙ্গামা, শান্তি ফিরিয়ে আনলো শহরে।

গভীর রাত্রে দেওয়ান দিলেন দেখা। যেন আকাশ থেকে পড়লেন। "য়্যাঁ, দাঙ্গা হয়েছে না কি? কী আস্পর্ধা! বদমাশদের শায়েস্তা করছি এখুনি। ডাকাত ব্যাটাদের আগে পাঠাবো জেলে, ফাঁসিতে লটকাবো তারপর—।" বলতে লাগলেন ওয়েকফিল্ড।

আসল ব্যাপার বুঝতে বাকী রইল না মহারাজের। তিনি আব্দুল্লা আর তার সঙ্গীদের গ্রেপ্তার করে আটক করলেন হরি পর্বতের গারদে। ওয়েকফিল্ডকে করলেন বরখাস্ত। তাড়িয়ে দিলেন অপদার্থ অকর্মণ্য অনেক কর্মচারীকে। শক্ত হাতে দমন করলেন সাম্প্রদায়িক আন্দোলন। রাজ্যে বিশৃঙ্খলার অজুহাতে মহারাজকে সরিয়ে কাশ্মীরের কর্তৃত্ব হাতে নেওয়ার যে চক্রান্ত ছিল ইংরেজের, তা সফল হলো না।

পনেরো

কয়েক বছর পরের কথা।

শেখ আব্দুল্লা গিয়েছিলেন পেশোয়ারে। সেখানে দেখেন এক বিরাট জনসভা। প্রায় লক্ষাধিক শ্রোতা। দীর্ঘদেহ পাঠানরা অধীর আগ্রহে শুনছে বক্তৃতা। কৌতূহলে আব্দুল্লা এগিয়ে গেলেন কাছে।

মঞ্চের উপরে শুভ্র খদ্দরের টুপি মাথায় বক্তা। নাতিদীর্ঘ ঋজুদেহ, উন্নতনাসা গৌরকান্তি পুরুষ। ললাটে বুদ্ধির দীপ্তি, চক্ষে সাহসের বহ্নি, চিবুকে কাঠিন্যের ইঙ্গিত। কণ্ঠে তীব্রতা নেই অথচ দৃঢ়তা আছে। যেন ঝকঝকে ইস্পাতের তলোয়ার। ব্যক্তিটি কে?

বক্তা আর কেউ নন—কংগ্রেস-নেতা পণ্ডিত জওহর লাল নেহরু। সভা শেষ হলে শ্রোতারা জয় ধ্বনি করতে করতে নেহরুকে ভক্তের মতো ঘিরে ধরলো চারদিকে।

শেখ আব্দুল্লা অবাক হলেন। তাই তো, হিন্দু নেহরু মুসলমান পাঠানদের এমন মন জয় করলেন কেমন করে? কী তাঁর কৌশল? কোথায় তাঁর আকর্ষণ? গেলেন নেহরুর কাছে। একবার নয়, দু'বার নয়, অনেকবার

অনেক কথা বললেন। অনেক কথা শুনলেন। জানতে পারলেন ভারতে জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাস, কংগ্রেস আন্দোলনের ধারা।

আব্দুল্লা নেহরুকে জানালেন, কাশ্মীরে মুসলীম চাষী মজুরদের দুঃখ-দুর্দশা। হিন্দু মহারাজ তাদের শোষণ করছেন।

নেহরু বললেন, চাষীরা গরীব বলেই দুঃস্থ, মুসলমান বলে নয়। সরকার হৃদয়হীন, তার কারণ এ নয় যে, তাঁরা হিন্দু বা ডোগরা, তার কারণ তাঁরা স্বৈরাচারী।

আব্দুল্লার চোখ খুললো।

পেশোয়ার থেকে ফেরার পথে আরও একটি ঘটনা ঘটলো। কাশ্মীরের এক আপেল বাগানের মধ্য দিয়ে আসছিলেন আব্দুল্লা। বাগানের মালিক এক ধনী মুসলমান। নিজে দাঁড়িয়ে ফল পাড়াচ্ছিলেন। মজুরেরা হিন্দু। গাছের কোনোখানে একটি ফলও যাতে রয়ে না যায় সেদিকে মালিকের কড়া দৃষ্টি। তাঁর তাড়ায় মজুরেরা ক্রমশঃ নীচের ডাল থেকে উঠছিল উঁচু ডালে। মানুষের ভারে গাছের শাখাগুলি এমন ঝুঁকে পড়েছে যে, আব্দুল্লার ভয় হলো, কখন বুঝি বা—কড়্‌ড়-কড়াৎ— 'বুঝি বা' নয়, সত্যি সত্যিই একটা গাছের সরু আগ ডাল ভেঙে পড়ল মাটিতে। বছর কুড়ি বয়সের একটি মজুর ধপাস শব্দে হলো ধরাশায়ী।

হা হা করে মালিক ছুটে এলেন। বসিয়ে দিলেন

শপাং শপাং করে কয়েক ঘা বেত। মরার উপর খাঁড়ার ঘা। গর্জন করতে লাগলেন। উল্লুক কোথাকার, গাছের এমন একটা ফলন্ত ডাল ভেঙে ফেললে। হায় হায়, কত টাকা লোকসান হলো। হতভাগার মজুরি কেটে নিতে হবে সবটা। তাতেই বা ক্ষতি পূরণ হবে কতটুকু? ইত্যাদি ইত্যাদি।

আব্দুল্লা ও আর পাঁচজনে মিলে কোনো মতে মাটি থেকে তুললেন আহত অচৈতন্য মজুরকে। নিয়ে যাওয়া হলো তার বাড়িতে। সেখানে আব্দুল্লা দেখলেন, ঠিক একই দুঃখ, কষ্ট, একই অভাব অনটন যা এতকাল দেখেছেন মুসলীম শাল কারিগরদের বাড়িতে। নেহরুর কথা মনে পড়ল, জনগণের যে দুর্দশা তার মূলে ধর্ম নয়,—অর্থ।

বদলে গেল শেখ আব্দুল্লার দৃষ্টিভঙ্গি, বদলে গেল তাঁর মত। বদলে গেলেন তিনি নিজে। যেন তাঁর নবজন্মলাভ।

সেবার শহরে কী নিয়ে যেন হিন্দু-মুসলমানে বাধলো এক বিতর্ক। তর্ক থেকে কলহ। কলহ থেকে ক্রোধ। তার পরেই দুই পক্ষে ইট-পাটকেল ছোড়াছুড়ি। হিন্দুদের বিপদ বেশী। সংখ্যায় তারা নগণ্য। এক ঘর হিন্দু বাড়ি ঘিরে বাস করে দশ ঘর মুসলমান।

ঝিলমের দু'নম্বর পুলের পাশে একটি ছোট হিন্দু মেয়ে জ্বরে মরে পড়ে ছিল দু'দিন। তার সৎকারের উপায়

নেই ; ভয়ে হিন্দুরা ঘরের বাইরে বেরোয় না। নিজেদের হাটবাজারে যাওয়া বন্ধ। শব নিয়ে শ্মশানে যাবে কে? মড়া পোড়াতে গিয়ে নিজেরা মারা পড়বে না কি? প্রাণহীন মেয়ে কোলে নিয়ে মা কেঁদে বুক ভাসাচ্ছেন রাত্রি দিন।

শুনতে পেয়ে শেখ আব্দুল্লা গেলেন সেই বাড়িতে। ছু' হাতে তুলে নিয়ে এলেন ছোট্ট মেয়েটির মৃত দেহ। ঝিলমের স্রোতে নিজ হাতে শিকারা বেয়ে নিয়ে চললেন শ্মশানে। নদীর ছুই তীরে শত শত মুসলমান চললো শিকারার পিছনে। তারা ধিক্কার দিতে লাগলো, "ছিঃ ছিঃ, কাফেরের মড়া পোড়াতে যাচ্ছে আব্দুল্লা! শেষ কালে শেখ হলো কাভোগ!"

কাভোগ মানে ডোম।

আব্দুল্লা চেঁচিয়ে জবাব দিলেন, "ধেৎ, মড়ার কী কোনো জাত থাকে রে, বোকার দল?"

সেই থেকে শেখ আব্দুল্লা হলেন এক নতুন মানুষ! সকল সম্প্রদায়ের লোক নিয়ে তিনি গড়লেন নতুন সমিতি। মুসলীম কনফারেন্স ভেঙে হলো ন্যাশন্যাল কনফারেন্স। বৃদ্ধ শিখ সর্দার বুধ সিং তার সভাপতি, তরুণ ব্রাহ্মণ প্রেমনাথ বাজাজ তার কর্মকর্তা, মুসলমান শেখ মহম্মদ আব্দুল্লা তার অধিনায়ক।

জনগণকে নিয়ে কাশ্মীরে শুরু হলো গণ-আন্দোলন। এতকাল যিনি ছিলেন মুসলীম নেতা

ঝিলম নদীর তীর

এখন তিনি হলেন গণনায়ক। হিন্দু মুসলমান এক সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে জয়ধ্বনি করল তাঁর "শের-ই-কাশ্মীর জিন্দাবাদ।" কাশ্মীরের ঘরে ঘরে সহস্র সহস্র অজ্ঞ, অন্ধ ও অসহায় নরনারীর কাছে তিনি আনলেন নবীন অরুণালোক। বঞ্চিত, লাঞ্ছিতকে তিনি দিলেন অভয় ও আশ্বাস। দিলেন বর্তমানের মন্ত্র ও ভবিষ্যতের স্বপ্ন। মৃতের দেশে তিনি নব ভাব-গঙ্গার ভগীরথ।

ষোল

কুক্ষণে মহারাজ হরি সিং-এর প্রধান মন্ত্রী হলেন রামচন্দ্র কাক। কাশ্মীরী পণ্ডিত। লোকটা সুচতুর। গোড়াতে শ্রীনগরে প্রতাপ সিং কলেজে লাইব্রেরীর কেরানী ছিলেন কুড়ি টাকা বেতনে। সেখান থেকে ধীরে ধীরে হয়েছেন সরকারী দপ্তরের নানা বিভাগের কর্তা, আইন সভার সভ্য, মন্ত্রী সভার সদস্য, সবশেষে দেওয়ান। রাজকার্যে তাঁর কড়া দৃষ্টি ছিল, কিন্তু রাজনীতিতে দূর দৃষ্টি ছিল না। কংগ্রেসকে তিনি করলেন মহারাজের শত্রু। তাঁরই হুকুমে কাশ্মীর রাজ্যে গ্রেপ্তার হলেন পণ্ডিত নেহরু। চিরকালের মতো বিরোধ ঘটে রইল কাশ্মীরের মহারাজ আর ভারতবর্ষের ভাবী প্রধান মন্ত্রীর মধ্যে।

দুর্ভাগ্য আর গরুর গাড়ি, আসে যখন ভিড় করে আসে। শ্রীনগরের পথে একদিন দেখা দিল এক সন্ন্যাসী। স্বামী সন্তদেব। কেউ বলে তাঁর বয়স দু' শ' বছর, কেউ বলে পাঁচ শ'। হিমালয়ের গুহায় বসে তপস্যা করেছেন এতদিন। ভক্তরা রটনা করলো স্বামীজী সিদ্ধপুরুষ। ভূত, ভবিষ্যৎ কিছু নেই তাঁর

অজানা। শুধু মুখের দিকে তাকিয়ে বলে দিতে পারেন মানুষের পূর্বজন্মের অজ্ঞাত ইতিহাস, আর পর জন্মের আগাম কাহিনী।

ক্রমে তাঁর খ্যাতি পোঁছল মহারাজারও কানে। স্বামীজীর ডাক পড়ল রাজপ্রাসাদে। সেখানে সন্তদেব দেবতার মতোই আসন পাকা করে বসলেন দু' দিনে।

সন্ন্যাসী মহারাজকে বললেন, "ইংরেজ চলে যাচ্ছে ভারতবর্ষ ছেড়ে। তোমার ললাটে দেখছি রাজ্য ক্ষেত্রের সুস্পষ্ট সামুদ্রিক লিখন। ইংরেজী 'এল্' অক্ষরের মতো। কোন শব্দের আদ্যে আছে 'এল্'? লাহোর এবং লাডাক। কুছ ফিকির নেই, মহারাজ, হনুমানজী কি কৃপাসে লাহোর থেকে লাডাক রাজ্য হবে তোমার।"

গুরুজীর অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস হলো হরি সিং-এর।

সেদিন থেকে হরি সিং-এর কাল হলো দুই,—কাক আর সন্তদেব। যেন জ্বরের সঙ্গে বিসূচিকা, ঝড়ের সঙ্গে বজ্রপাত। মন্ত্রী দেয় দুর্বুদ্ধি, গুরু দেয় দুরাশা। সর্বনাশের পথে দ্রুত এগিয়ে চলেন মহারাজ। অন্য সব দেশীয় রাজারা যখন একে একে যোগ দিচ্ছেন ভারত সরকারের সঙ্গে, তখন তিনি স্বপ্ন দেখেন ভারতবর্ষ আর পাকিস্তানের মাঝখানে এক বিস্তীর্ণ স্বাধীন সাম্রাজ্যের। লাহোর থেকে লাডাক। ইংরেজী 'এল্' আছে তাঁর ললাটে! হুঃ, সে কি আর অমনি?

ঝিলম নদীর তীর

নদীর জোয়ারের মতো সংসারে সুযোগ আর সময়ও বসে থাকে না কারো জন্যে। মহাকালের কাছে মহারাজারও খাতির নেই। দিন আর মাস বয়ে গেল হেলায়। স্বপ্নভঙ্গে হরি সিং যখন চোখ মেললেন, রাজধানী তখন যায় যায়, রাজ্যপাট টলোমলো। অগত্যা প্রাণের দায়ে পাকিস্তানী হানাদার ঠেকাতে ধরনা দিতে হলো ভারত সরকারেরই কাছে। প্রধান মন্ত্রী নেহরু বললেন, সৈন্য তিনি পাঠাবেন। কিন্তু মহারাজের পিছনে চাই জনমতের সমর্থন।

আগের কালের রাজারা তাঁদের আপন খেয়ালে রাজ্য চালাতেন। রেগে কারো নিতেন শির, কাউকে চড়াতেন শূলে। খুশিতে কাউকে দিতেন ধন-দৌলত, কাউকে বানাতেন সভাসদ। রাজকন্যাসহ অর্ধেক রাজত্ব দান করতেন ইচ্ছামতো। তখন প্রজা শুধু চোখ বুজে খাজানা যোগাতো, মুখ বুজে দুঃখ সইতো। পাইক পেয়াদার পকেট পুরিয়ে খালি পেটে ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে বলতো, "রাজ্যেশ্বরো জগদীশ্বরো বা"।

সেদিন আর নেই। প্রজা ফেলবে কড়ি, রাজা মাখবে তেল—এ রীতি একালে অচল। এখন দেশের লোক চায় দেশ শাসনের ভার। রাজাকে রাজ্য চালাতে হয় প্রজার পরামর্শ শুনে। নেহরু বললেন, জননেতাকে দিতে হবে কাশ্মীরের জনশাসনের ভার।

তথাস্তু। আব্দুল্লা হলেন কাশ্মীর শাসন ব্যবস্থার সাময়িক অধিকর্তা,—হেড অব য়্যাডমিনিস্ট্রেশান।

ঝিলম নদীর তীর

রাজ্য সরকারের মাথা হয়েই কিন্তু আব্দুল্লার মাথা গেল ঘুরে।

আসলে আব্দুল্লা লোকটার নিজস্ব কোনো মত নেই। যখন যার বুদ্ধি নেন, তখন তারই কথা বলেন, যার সাথে থাকেন তারই পথে চলেন। সঙ্গদোষ বড় দোষ। তার উপরে আছে আবার ক্ষমতার স্বাদ। লোভী বালকের ভোজন স্পৃহার মতো তা কেবলই বাড়তে থাকে।

আব্দুল্লার আশেপাশে আবার এসে জুটলো কয়েকটি ক্রূর ও স্বার্থপর মুসলমান। তারা রাত্রিদিন ঘিরে থাকে তাঁকে। দুধের বাটির চার পাশে যেমন ভন্ ভন্ করে মাছি। দুষ্ট সরস্বতীর মতো তারা কেবলই দুষ্টবুদ্ধি দিলো অষ্টপ্রহর।

দেখতে দেখতে আব্দুল্লার মন আর মতি দুই-ই আবার হলো ভ্রান্তিতে আচ্ছন্ন ও স্বার্থবোধে মলিন। জাতীয়তা-বাদের উন্নত শীর্ষ থেকে ধাপে ধাপে গড়িয়ে পড়লেন সাম্প্রদায়িকতার অতল গহ্বরে। জলে ভেজা পতুলের মতো তাঁর রং ধুয়ে মুছে বেড়িয়ে পড়লো ভিতরের কাদা-মাটির ডেলা। রূপ ঘুচে গিয়ে দেখা দিলো স্বরূপ।

আব্দুল্লার রাগ ছিল হরি সিং-এর উপরে ষোল আনা। মহারাজ যে তাঁকে জেলে পুরেছিলেন, সেকথা ভুলতে পারেন নি তিনি কোনো দিন। কিন্তু কথামালার উটের গল্প জানা ছিল তাঁরও। দড়িতে একবারেই হেচ্‌কা টান দিলে তা' ছিঁড়ে যাওয়ার আশঙ্কা। তাই আস্তে

আস্তে জাল গুটিয়ে আনলেন তিনি। এগোলেন ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে।

আব্দুল্লা প্রথমে চাইলেন কাশ্মীরে পুরোপুরি এক মন্ত্রীসভা। হরি সিং হবেন ক্ষমতাহীন নিয়মতান্ত্রিক মহারাজ। যেমন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে আছে রাজ্যপাল। কাজের জন্য নয়, সাজের জন্য। নৈবেদ্যের চূড়ায় যেমন সন্দেশ, খোঁপার উপরে যেমন গোলাপ ফুল।

ভারত সরকারের অনুগ্রহে শেখ মহম্মদ আব্দুল্লা হলেন কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রী।

কাটলো কিছু কাল। হরি সিং-এর প্রতাপ নেই, কিন্তু প্রভাব আছে। সরকারী কর্মচারীরা তখনও মহারাজকেই মনে করে রাজ্যের মালিক। নিরক্ষর চাষী মজুরেরা পুরানো অভ্যাসে তখনও বিপদে দেয় মহারাজের দোহাই, আমোদে আহ্লাদে মহারাজের গায় জয়। সেটা প্রধান মন্ত্রীর পছন্দ নয়। ততক্ষণে ভারতীয় সৈন্যদল হানাদারদের তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে দূরে। আব্দুল্লা ভাবলেন, এই সময়। তিনি তাঁর ধনুকে দিলেন টঙ্কার। তূণ থেকে বের করলেন দারুণ অগ্নিবাণ। হরি সিং-এর কপাল গেল পুড়ে।

ভারত সরকারের কাছে পত্র দিলেন আব্দুল্লা, রাজ্যের জনগণ চায় না হরি সিংকে। সিংহাসন ছাড়তে হবে তাঁকে।

সে কী কথা? শুনে চমকে ওঠেন মহারাজ। ছুটে

আসেন দিল্লীতে। সেখানে তাঁর সহায় কে? গেলেন নেহরুর কাছে। হায়, তিনি হরি সিং-এর বন্ধু নন। শেখ আব্দুল্লার উপরেই তাঁর অটুট বিশ্বাস। রাজতন্ত্রের চাইতে গণতন্ত্রে তাঁর আস্থা বেশী। তাঁর কাছে মহারাজের অনুনয় নিষ্ফল।

অবশেষে একটা মাসোহারা নিয়ে গদি ছেড়ে দেওয়া ছাড়া গতি রইল না আর। তরুণ যুবরাজ করণ সিং হলেন রিজেণ্ট—অর্থাৎ পিতার অবর্তমানে কাশ্মীরের রাজ্যধর। তাঁর বয়স তখনও আঠারো পার হয়নি।

রাজপুত্র না হয়েও রাজা হয়েছিলেন হরি সিং। রাজা হয়েও রাজ্য হারালেন তিনি। ইংরেজী 'এল্' অক্ষরটা আছে আরও একটা ইংরেজী শব্দের গোড়ায়। সেটা—'লস্ট'। গুরু সন্তদেবের তা' জানা ছিল না। শিষ্য হরি সিং-এর তা' মনে ছিল না। মূর্খ হরি সিং!

রাজ্যহারা হরি সিং গেলেন বম্বে। নিরালা নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে লাগলেন সেখানে।

ঘরের জানালা দিয়ে দেখা যায় দূরে জুহুর সমুদ্র তীর। বেলাভূমিতে কেবলি আছাড় খেয়ে পড়ছে ফণাতোলা সাপের মতো অসংখ্য সাগর তরঙ্গ। ঢেউ-এর পরে ঢেউ। বিরামহীন, সংখ্যাহীন। দিনের পর দিন কর্মহীন হরি সিং তাকিয়ে থাকেন তার দিকে। মাঝে মাঝে নিজের অজান্তেই মন উধাও হয়ে যায় দূর দূরান্তের দেশে। সেখানে পাহাড়ের মাথায় সোনালী রৌদ্রে ঝলমল করছে রূপালী

বরফের আস্তরণ, চার-চেনারীর পাতায় বইছে ঝিরঝিরে হাওয়া, ঝিলমের স্রোতে হরতনের টেক্কার মতো বৈঠা নিয়ে মাঝিরা বাইছে ঝালর আঁটা রঙিন শিকারা, আমীরাকদলের পুলের কিনারায় লাঠি হাতে নিঃস্ব দুঃখীর দল 'মিস্কিন', 'মিস্কিন' বলে' হাত বাড়িয়ে মাগছে ভিখ্।

সে দেশ থেকে চিরকালের মতো বিদায় হয়েছেন হরি সিং। সেখানে কোনোদিন আর ঘটবে না তাঁর পদক্ষেপ। মন্দমতি, ভ্রষ্টনীড়, ভাগ্যহত হরি সিং।